সংক্ষিপ্ত
সংস্করণ

নারীরা, আমাদের ক্ষমা করুন!



বিবাহ ও মণ্ডলীতে পুরুষ ও নারী
সংক্ষিপ্ত। স্পষ্ট। উপকারী।

HANS-JÖRG RONSDORF

নারীরা, আমাদের ক্ষমা করুন!

সংক্ষিপ্ত সংস্করণ

বিবাহ ও মণ্ডলীতে পুরুষ ও নারী

সংক্ষিপ্ত। স্পষ্ট। উপকারী।

Hans-Jörg Ronsdorf

মুদ্রিত বই (জার্মান ভাষায়) www.hans-joerg-ronsdorf.de থেকে অর্ডার করা যায়
মূল্য: € ৩.৮০, ডাকখরচ আলাদা।
জার্মান সংস্করণটি Kindle eBook হিসেবেও পাওয়া যায়।
৪র্থ সংস্করণ, নভেম্বর ২০২৬ (জার্মান সংস্করণ)
জার্মান থেকে অনুবাদ, ২০২৬ – বিনামূল্যে ডাউনলোড: www.hans-joerg-ronsdorf.de
© Hans-Jörg Ronsdorf – সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
Albis 6½, 87477 Sulzberg
অক্ষরবিন্যাস: Hans-Jörg Ronsdorf
যোগাযোগের ইমেইল: hj-ronsdorf@t-online.de
জার্মান সংস্করণের ISBN: 978-3-9820715-6-5
প্রচ্ছদ নকশা: Tobias Stricker
প্রুফ সংশোধন: Gabriele Singer
মুদ্রণ: www.wir-machen-druck.de
জার্মান সংস্করণে ব্যবহৃত বাইবেল অনুবাদ (অন্যভাবে উল্লেখ না থাকলে):
Elberfelder Übersetzung, Edition CSV, Hückeswagen www.csv-bibel.de (জার্মান বাইবেল অনুবাদ)

সূচিপত্র

১ ভূমিকা – আবার একটি বই কেন? **৬**

২ আমাদের ভিত্তি – আমরা কিসের উপর দাঁড়াই? **৮**

৩ শুরুতে ফিরে যাই – ঈশ্বর যা চেয়েছিলেন **১০**

৪ সৃষ্টির শৃঙ্খলা – যদি থাকে, তবে কোনটি? **১৩**

৫ যা ঘটতে চলেছিল – কিন্তু ঈশ্বর কখনো চাননি **১৫**

৬ যীশু, সেই খ্রীষ্ট, ও নারীরা **২০**
- **৬.১ যাকোবের কূপের ধারে শমরীয় নারী** **২০**
- **৬.২ যীশুর চরণতলে – মার্থা ও মরিয়ম** **২১**
- **৬.৩ মগ্দলীনী মরিয়ম, প্রেরিতদের প্রেরিত** **২২**

৭ কনেরূপী মণ্ডলী ও নারীদের পরিচর্যা **২৩**
- **৭.১ পৌল ও তাঁর নারী সহকর্মীরা** **২৩**
  - ৭.১.১ ফৈবী – ডিকন, নেত্রী ও পত্রবাহিকা ২৪
  - ৭.১.২ এক আদর্শ দম্পতি: প্রিষ্কা ও আক্কিলা ২৪
  - ৭.১.৩ যূনিয়া – সম্মানিত নারী প্রেরিত ২৫

৮ বোনদের জন্য কি নীরবতার আদেশ আছে? **২৬**
- **৮.১ ভাববাণীর বিচার** **২৭**
- **৮.২ ৩৪ ও ৩৫ পদ কি একটি উদ্ধৃতি?** **২৮**
- **৮.৩ ৩৪ ও ৩৫ পদ কি পরে যোগ করা?** **২৮**

৯ বোনদের জন্য কি শিক্ষাদানে নিষেধাজ্ঞা আছে? **৩১**

১০ সকল বিশ্বাসীর যাজকত্ব **৩৫**

১১ বোনেরা কি প্রাচীন হতে পারেন? **৩৭**

১২ মাথা ঢাকা – আজও? **৪০**

১৩ পুরুষ মস্তক – একতরফা বশ্যতা? **৪৫**

১৪ নর ও নারীর ভেদ আর নেই **৪৮**

১৫ আমাদের দোষ স্বীকার **৫১**

১৬ শেষ কথা **৫৩**

১৭ লেখকের অন্যান্য বই ৫৭

১ ভূমিকা – আবার একটি বই কেন?

২০২০ সালের নভেম্বরে আমার বই "নারীরা, আমাদের ক্ষমা করুন!" (Frauen, vergebt uns!) প্রকাশিত হয়। প্রত্যাশিতভাবেই ভুল বোঝাবুঝি, এমনকি ক্ষোভও দেখা দিল। কারণ বাইবেলের প্রতি বিশ্বস্ত ভাইয়েরা মনে করলেন, এই শিরোনাম তাঁদের এক ধরনের জিম্মি করে রেখেছে। নারী সম্পর্কে তাঁদের ধারণা যখন পবিত্র শাস্ত্রেরই অনুরূপ, তখন কেন তাঁরা ক্ষমা চাইবেন?

বিষয়টি এখনও সেই একই: দুটি পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি – নিচের তুলনামূলক সারণিটিও দেখুন।

> একটি দৃষ্টিভঙ্গি নারীর উপরে মস্তক হিসেবে পুরুষের কর্তৃত্বকে সমর্থন করে। এই মত অনুসারে, পতনের আগেও সৃষ্টির শৃঙ্খলা এমনই ছিল। এই কারণে স্ত্রী তাঁর স্বামীর বশ্যতা স্বীকার করেন, উপাসনায় নীরব থাকেন, এবং মণ্ডলীর ভেতরে ও বাইরে পুরুষদের শিক্ষা দেন না ও নেতৃত্ব দেন না।
>
> বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির শুরু থেকেই দেখে সমতা ও পারস্পরিক পরিপূরকতার এক অংশীদারি – কোনো স্তরভেদ ছাড়া। পরস্পরের বশ্যতা একসঙ্গে পথচলাকে গড়ে তোলে। মণ্ডলীতে বোনেরা সব ক্ষেত্রে ভাইদের মতোই পরিচর্যা করেন।

দুটি দৃষ্টিভঙ্গিরই যুক্তি দেওয়া হয় বাইবেল থেকে। কিন্তু এই দুই বিশ্বদৃষ্টি পরস্পরের সঙ্গে মেলে না – বহু বই পড়ে, বক্তৃতা শুনে ও অনেক আলোচনার পর এটাই আমার সিদ্ধান্ত। হায় ঈশ্বর, কী দুঃখের কথা! আমরা এক কঠিন ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিতর্কের সামনে দাঁড়িয়ে, যা দুঃখজনকভাবে মণ্ডলীগুলোকে বিভক্ত করে। আমি চাই, এ বিষয়ে আরও খোলামেলাভাবে, বস্তুনিষ্ঠভাবে ও শান্তিপূর্ণভাবে বিতর্ক হোক।

এই ছোট বইয়ে আমি দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করি ও ব্যাখ্যা করি। প্রথমটিকে আমি আমার ৫৪ বছর বয়স পর্যন্ত সমর্থন করেছি ও শিক্ষা দিয়েছি। পবিত্র শাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে আমাকে দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে আসতে হলো। এ বিষয়ে আমি একটি বিস্তারিত বই লিখেছি। অনেক বোনের কাছে এই বই ছিল দীর্ঘদিনের, সচেতন বা অচেতনভাবে আকাঙ্ক্ষিত এক মুক্তি, আবেগের এক ভার লাঘব। কিছু প্রতিক্রিয়া আমাকে আনন্দে, আবার দুঃখেও কাঁদিয়েছে। এই বিষয়ে এখনও অনেক কিছু ঠিক নেই। এর জন্য দায়ী সেই ভাইয়েরা, যাঁরা মনে করেন, তাঁরা বাইবেল ঠিকভাবে বোঝেন। নিজেদের উপলব্ধি থেকে তাঁরা উপাসনায় নারীদের কথা বলা, শিক্ষা দেওয়া ও নেতৃত্বের দায়িত্ব নিষেধ করেন। অনেক বোন তা বুঝতেও পারেন না, মেনেও নিতে পারেন না। অনেকে এর জন্য কষ্ট পান, কিন্তু এ নিয়ে চুপ থাকেন।

ইতিমধ্যে আমার বইটি বেশ কিছুটা প্রচার পেয়েছে, কিন্তু ভাইয়েরা তা পড়তে অস্বীকার করেন। তাঁদের মতে বইটি খুব জটিল, খুব দীর্ঘ, খুব একপেশে, খুব পক্ষপাতদুষ্ট, খুব ফেমিনিস্ট। তাই

আবারও এই ছোট ও সহজভাবে লেখা বই। আরও বিস্তারিত ও ব্যাপক উপকরণের জন্য আমি আমার ওয়েবসাইটের কথা বলছি (জার্মান ভাষায়): **www.hans-joerg-ronsdorf.de**।

ঈশ্বরের সামনে আমি নিশ্চিত যে, আমি ঠিক কাজ করছি; তবুও আমার ভুল হতে পারে। কিন্তু আমি খ্রীষ্ট ও তাঁর বাক্যের প্রতি দায়বদ্ধ। আমিও আমার বিবেকের কাছে বাঁধা। বিষয়টি নিছক কোনো ঈশ্বরতাত্ত্বিক বা বিমূর্ত বিতর্ক নয়, বিষয়টি খ্রীষ্টের অর্ধেক দেহ নিয়ে, মানুষ ও তাদের জীবন নিয়ে!

Hans-Jörg Ronsdorf, Sulzberg, নভেম্বর ২০২৬

পুরুষ ও নারী সম্পর্কে স্তরভিত্তিক দৃষ্টি: বশ্যতা, কর্তৃত্ব, মস্তক: স্তরবিন্যাসমুখী	**স্তরবিন্যাস ছাড়া পারস্পরিক পরিপূরকতা: গালাতীয় ৩:২৮ – খ্রীষ্টে সকলেই এক! . বরদানমুখী**
সৃষ্টির শৃঙ্খলার স্তরবিন্যাস, পুরুষ নারীর উপরে, সমমূল্যের, কিন্তু সমান অধিকারসম্পন্ন নয়।	সমকক্ষ করে সৃষ্ট, দুজনেই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বহনকারী, তাঁরা একে অপরের পরিপূরক, সমান মর্যাদায়, সমান অবস্থানে।
আদিপুস্তক ৩:১৬ "সে তোমার উপরে কর্তৃত্ব করবে" – একে বিধান / আদেশ হিসেবে বোঝা হয়, পতনের নেতিবাচক পরিণতি হিসেবে নয়।	আদিপুস্তক ৩:১৬ পতনের দুঃখজনক পরিণতি বর্ণনা করে, যা ঈশ্বর চাননি এবং যা দুঃখের বিষয়, ইতিহাসে এভাবেই ঘটেছে।
হবা প্রতারিত হয়েছিলেন, তাই নারীরা শিক্ষা দিতে পারেন না।	আদম ইচ্ছাকৃতভাবে পাপ করেছিলেন, হবা প্রলুব্ধ হয়েছিলেন। শিক্ষাদানে নিষেধাজ্ঞা লিঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, বরং শিক্ষাটি সুসমাচারের অনুরূপ কি না, তার সঙ্গে সম্পর্কিত।
নারী মণ্ডলীতে নীরব থাকেন। শিক্ষার প্রশ্নে নিজের ঘরেও তিনি স্বামীর সামনে চুপ থাকেন।	পুরুষ ও নারী একসঙ্গে ভাববাণী বলেন, যেমন পঞ্চাশত্তমীর দিনে ঘটেছিল। যোয়েল ২:২৮-২৯; প্রেরিত ২:১৭
মস্তক হওয়া মানে পুরুষের কর্তৃত্ব।	মস্তক ও দেহ একতা ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর জোর দেয়।
নারীরা পুরুষের উপরে কোনো কর্তৃত্ব রাখতে পারেন না।	পরস্পরের বশ্যতা, অধিকার ও কর্তৃত্ব, ১ করিন্থীয় ৭:৪
কেবল পুরুষেরাই নেতৃত্ব দিতে এবং প্রাচীন ও ডিকন হতে পারেন।	আত্মিক বরদান লিঙ্গের সঙ্গে বাঁধা নয়।
গালাতীয় ৩:২৮ "নর ও নারী আর হইতে পারে না ... খ্রীষ্ট যীশুতে তোমরা সকলেই এক" – এর অর্থ কেবল পরিত্রাণে এক আত্মিক সমতা, যা কিন্তু সৃষ্টির শৃঙ্খলাকে বাতিল করে না।	গালাতীয় ৩:২৮ খ্রীষ্টে নতুন সৃষ্টির বর্ণনা, যা মণ্ডলীতে ইতিমধ্যেই উপস্থিত। ঠিক সেখানেই সব সামাজিক, শ্রেণিগত ও লিঙ্গগত পার্থক্য সম্পূর্ণভাবে লোপ পায়।

২ আমাদের ভিত্তি – আমরা কিসের উপর দাঁড়াই?

সব খ্রীষ্টীয় কাজের মাপকাঠি, এমনকি মানদণ্ড, কেবল বাইবেল – আজও, আর চিরকাল। আজ যেভাবে তা আমাদের হাতে আছে। এটিই আমাদের একমাত্র ও নির্ভরযোগ্য উৎস। সবকিছুকে এর দ্বারা যাচাই করতে হয়। ঐতিহ্যকেও। অতি প্রাচীন হোক বা অপেক্ষাকৃত নতুন। প্রায়ই বাইবেলের সত্য – অথবা আরও ঠিকভাবে বললে: আমরা যেভাবে তা বুঝি – আর খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্যকে সমান মর্যাদা দেওয়া হয়। ঐতিহ্য শাস্ত্রের ভুল বোঝার উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। ঠিক তেমনি বিভ্রান্তিকর হলো যুগের হাওয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো। তখন সময়ের সঙ্গে এমন সব বিশ্বাস ও রীতি জমে ওঠে ও পাকাপোক্ত হয়, যা সেকেলে, কারণ সেগুলো বিগত শতাব্দীগুলোর, কিংবা মাত্র কয়েক দশক আগের সংস্কৃতিকে প্রতিফলিত করে।

সেগুলো সুসমাচারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

লোকে একটু বাড়িয়ে বলে: বাইবেল দিয়ে সবকিছুই প্রমাণ করা যায়। সত্যিই এটি আমাদের জন্য এক চ্যালেঞ্জ, কারণ কথাটি সত্য। খ্রীষ্টানদের মধ্যে কত পরস্পরবিরোধী মত আছে, যার প্রতিটিকেই কমবেশি ভালোভাবে বাইবেল দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাইবেলের এমন কোনো বিষয় নেই, যার অন্তত দুটি বা তার বেশি ব্যাখ্যা নেই।

বাইবেল পড়ার সময় এবং আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে বা মণ্ডলীর জীবনে তা প্রয়োগ করার সময় কিছু নিয়ম বা নীতি মেনে চলা উচিত। আমি কয়েকটির কথা বলছি, যেগুলো আমাদের এই বিষয়ের জন্য এবং অন্য যে কোনো বিষয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

অংশটি কার উদ্দেশে কথা বলছে? পুরাতন নিয়মের নির্দেশগুলো, যেমন যাজকদের প্রতি নির্দেশ, আজকের মণ্ডলীর জীবনে আর প্রযোজ্য থাকবে না। একে বলা হয় “পরিত্রাণের ইতিহাসভিত্তিক বাইবেল-ব্যাখ্যা”। লক্ষ রাখা হয়, কোন কথা কোন সময়ে ও কোন সময়ের জন্য প্রযোজ্য। কথাগুলো কি ইস্রায়েল জাতির উদ্দেশে, নাকি নতুন নিয়মের মণ্ডলীর উদ্দেশে বলা?

মণ্ডলীর জীবনের জন্য কোনো নির্দেশ কি দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্ট, আর তা কি একাধিকবার এসেছে? তাহলে তাকে মানদণ্ডমূলক ও সব যুগের জন্য প্রযোজ্য নির্দেশ বলা যায়। এর বিপরীতে, কঠিন অংশগুলোকে – বিশেষ করে যখন তাদের মূল বক্তব্য নতুন নিয়মে মাত্র একবার আসে, আর যেগুলো নিয়ে বাইবেলের প্রতি বিশ্বস্ত বহু ঈশ্বরতত্ত্ববিদ ও ব্যাখ্যাকার একমত নন – সবার জন্য বাধ্যতামূলক নিয়মে পরিণত করা উচিত নয়।

প্রসঙ্গই নির্ণায়ক। প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করা কথা দিয়ে সবকিছু ও যে কোনো শিক্ষাকে সমর্থন করা যায়। আসলে অন্য যে সাহিত্য আমরা পড়ি, সেখানেও আমরা এই নিয়ম মেনে চলি। এখানে কেবল নিকটতম প্রসঙ্গ নয়, শেষ পর্যন্ত সমগ্র পবিত্র শাস্ত্রের প্রসঙ্গই গণ্য। প্রশ্ন হলো, ব্যাখ্যাটি বাইবেলের সামগ্রিক চিত্রের সঙ্গেও খাপ খায় কি না।

ঠিক তেমনি গুরুত্বপূর্ণ **ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ ও পটভূমি** – কোন সময়ে ও কোন স্থানে একটি অংশ লেখা হয়েছিল। এমন জ্ঞান ছাড়াও বাইবেল পড়া যায়। তাতে এর ঐশ্বরিক কার্যকর শক্তি একটুও কমে না। তবে ঐতিহাসিক পটভূমি জানা সবসময়ই সহায়ক। নতুন নিয়মের প্রায় সব পত্রই তো কোনো জরুরি উপলক্ষের কারণে সংশ্লিষ্ট মণ্ডলীর কাছে লেখা হয়েছিল। আমরা সেই উপলক্ষটি পুনর্গঠন করার চেষ্টা করি।

কখনো কখনো জানা জরুরি, **মূল ভাষায় একটি শব্দের অর্থ কী।** কারণ বাইবেলের হিব্রু ও গ্রিক ভাষা আজ আর কেউ বলে না, আর আমরা একেবারে অন্য এক ভাষায় কথা বলি। সঠিক অনুবাদ জরুরি। কিন্তু অনুবাদও সবসময় কিছুটা ব্যাখ্যা। আর একজন অনুবাদক এই বা ওই বিষয়ে কী ভাবেন, তা তাঁর অনুবাদকে প্রভাবিত করবে। এর যথেষ্ট উদাহরণ আছে।

শেষে এখানে এই কথাটি বলি: কিছু বিষয় **আক্ষরিক বা শব্দগতভাবে**, আবার অন্য কিছু **রূপকভাবে বা দৃষ্টান্ত হিসেবে** বুঝতে হয়। হয়তো সৃষ্টির বিবরণের কিছু অংশেও এ কথা খাটে।

৩ শুরুতে ফিরে যাই – ঈশ্বর যা চেয়েছিলেন

পুরুষ হওয়া ও নারী হওয়া এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝতে চাইলে আমরা কোথা থেকে শুরু করব? অবশ্যই: আমরা সৃষ্টির কাহিনিতে যাই। সেটিই আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ দেয়। নতুন নিয়মে পৌলই একাধিকবার এই শুরুর কথা উল্লেখ করেন, যখন তিনি করিন্থ ও ইফিষের সমস্যাজনক অনিয়মের সমালোচনা ও সংশোধন করেন। তিনি সৃষ্টির বিবরণকে কখনো সাধারণভাবে, আবার কখনো নির্দিষ্টভাবে প্রয়োগ করেন। **কেবল পৌলের কথার মাধ্যমে সৃষ্টির এই বিবরণ ব্যাখ্যা করা যথেষ্ট নয়।** প্রথমে আমাদেরও এদন উদ্যানে যেতে হবে এবং দেখতে হবে, সেখানে কী ঘটেছিল আর কীভাবে ঘটেছিল। পরে আমরা পৌলের কাছে ফিরে আসব।

আসুন, আমরা মানবজাতির ইতিহাসের শুরুতে যাই। আমি অংশটি এলবারফেল্ডার বাইবেল (Elberfelder, জার্মান বাইবেল অনুবাদ) থেকে তুলে দিচ্ছি:

> আদিপুস্তক ১:২৬-২৮ (জার্মান এলবারফেল্ডার বাইবেল থেকে অনূদিত) আর ঈশ্বর বললেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্য অনুসারে মানুষ নির্মাণ করি; আর তারা সমুদ্রের মাছের উপরে, আকাশের পাখিদের উপরে, গবাদি পশুর উপরে, সমস্ত পৃথিবীর উপরে এবং পৃথিবীতে চলাফেরা করে এমন সব সরীসৃপের উপরে কর্তৃত্ব করুক! আর ঈশ্বর তাঁর প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি করলেন, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই তাকে সৃষ্টি করলেন; পুরুষ ও নারী করে তাদের সৃষ্টি করলেন। আর ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করলেন, এবং ঈশ্বর তাদের বললেন, তোমরা ফলবান হও ও বৃদ্ধি পাও, পৃথিবী পূর্ণ করো ও তাকে বশীভূত করো; আর সমুদ্রের মাছের উপরে, আকাশের পাখিদের উপরে এবং পৃথিবীতে চলাফেরা করে এমন সব প্রাণীর উপরে কর্তৃত্ব করো!

সৃষ্টির ষষ্ঠ দিনে, প্রথমে পশুদের সৃষ্টির পর, মানুষ দৃশ্যপটে আসে। পুরুষ ও নারী রূপে মানুষ। এক নিঃশ্বাসে দুই লিঙ্গেরই নাম বলা হয়েছে। দুজনেই – আলাদাভাবে প্রত্যেকে, আবার একসঙ্গেও – ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বহনকারী। কোনো পার্থক্য ছাড়া। কোনো পদমর্যাদার ক্রম ছাড়া। কোনো স্তরবিন্যাস ছাড়া। দুজনেরই একসঙ্গে সৃষ্টির উপরে কর্তৃত্ব করার কথা। এর অর্থ, যত্নের সঙ্গে সৃষ্টির দেখাশোনা করা ও তাকে রক্ষা করা। এর জন্য দুই লিঙ্গই প্রয়োজন।

ষষ্ঠ দিনে জগৎ তখনও ঠিকঠাক, যেমন হওয়ার কথা, তেমনই।

একটি দ্বিতীয় বিবরণ আছে, যা এবার ক্যামেরার মতো জুম করে মানুষের সৃষ্টির ঘটনার একেবারে কাছে চলে যায়। পুরাতন নিয়মের, অর্থাৎ হিব্রু বাইবেলের এই অতি প্রাচীন লেখাগুলো সত্যিই রহস্যময়, আজকের আমাদের পক্ষে হয়তো সহজে বোঝা যায় না। এখানেও প্রশ্ন ওঠে, কোনটি আক্ষরিক আর কোনটি রূপক অর্থে বলা। আজকের মানুষ হিসেবে আমাদের কিছু প্রশ্নের উত্তর মেলে না। আমরা হলে বিবরণটি সম্ভবত অন্যভাবে বা আরও বিস্তারিতভাবে লিখতাম। যা হোক,

যা আমাদের আছে, তা নিয়েই আমাদের খুশি থাকতে হবে। মূলত সবকিছুই আমাদের কাছে বোধগম্য ও যুক্তিসংগত, আবার গভীর অর্থপূর্ণও। কেবল ঈশ্বরই এই ঘটনাগুলো আমাদের কাছে প্রকাশ করতে পারেন। দুজন মানুষ সেখানে উপস্থিত থাকলেও তাঁরা নন, বরং পরে মোশি তা লিখে রেখেছেন।

নিচের বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে, আদমকে প্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছিল:

> আদিপুস্তক ২:১৮-২০ (জার্মান এলবারফেল্ডার বাইবেল থেকে অনূদিত) আর সদাপ্রভু ঈশ্বর বললেন, মানুষের একা থাকা ভালো নয়; আমি তার জন্য তার অনুরূপ সহায় নির্মাণ করব। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মাটি থেকে মাঠের সব পশু ও আকাশের সব পাখি গঠন করলেন, এবং মানুষ তাদের কী নাম দেন, তা দেখার জন্য তাদের মানুষের কাছে আনলেন; আর মানুষ যে জীবন্ত প্রাণীকে যে নাম দেবেন, সেটাই তার নাম হবে। আর মানুষ সব গবাদি পশুর, আকাশের পাখিদের ও মাঠের সব পশুর নাম দিলেন। কিন্তু আদমের জন্য কোনো অনুরূপ সহায় পাওয়া গেল না।

আদম একা। সৃষ্টিকর্তা স্পষ্ট করে দেন যে, কোনো পশুই তাঁর অনুরূপ নয়। এই মুহূর্তে আদমের কোনো কাজের পশুর প্রয়োজন নেই, বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে একটি কুকুরেরও নয়। না, তাঁর প্রয়োজন এমন কাউকে, যে তাঁর অনুরূপ। মনের ও হৃদয়ের এক বন্ধু। এক মুখোমুখি সমকক্ষ সঙ্গী। তাহলে একা থাকা, নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্য ঈশ্বর কি হয়তো দ্বিতীয় একজন আদম সৃষ্টি করতে পারতেন না? কিন্তু তাঁর অভাব দ্বিতীয় কোনো আদমের নয়। তাঁর অভাব এক সহায়ের। এমন একজনের, যে তাঁর অনুরূপ। অর্থাৎ একজন মানুষের। সমান শক্তির। কোনো দাস বা সহকারীর অভাব নয়। সে-ও সাহায্য করতে পারত। কিন্তু সে তাঁর অনুরূপ হতো না। সে তাঁর অধীন হতো। বিষয়টি হলো একজন মুখোমুখি সমকক্ষ সঙ্গী খুঁজে পাওয়া, তাঁর মতোই একজন মানুষ। সমান শক্তিশালী এক ব্যক্তিত্ব। যাঁর সঙ্গে তিনি এক হয়ে উঠতে পারেন। তাঁর অস্তিত্বের প্রতিটি দিকের এক প্রতিরূপ, এক পরিপূরক।

আদমকে প্রথমে এই জন্য সৃষ্টি করা হয়নি যে, তাঁকে মস্তক বা নেতা হতে হবে। না, তাঁকে প্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছিল, যেন তিনি একা থাকার অভিজ্ঞতা পান ও তা অনুভব করেন। এটি ছিল তাঁর অনুরূপ সহায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও একসঙ্গে জীবনযাপনের জন্য তাঁর প্রস্তুতি।

নারীর সৃষ্টির বর্ণনা দেওয়া পরের অংশটি রহস্যময়, কিন্তু অনেক কিছু বলেও:

> আদিপুস্তক ২:২১-২২ (জার্মান এলবারফেল্ডার বাইবেল থেকে অনূদিত) আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মানুষকে গভীর নিদ্রায় মগ্ন করলেন, আর তিনি নিদ্রাগত হলেন। পরে তিনি তাঁর একটি পাঁজর নিলেন এবং সেই জায়গা মাংস দিয়ে বন্ধ করে দিলেন; আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মানুষ থেকে নেওয়া সেই পাঁজর দিয়ে একজন নারী গড়লেন এবং তাঁকে মানুষের কাছে আনলেন।

ঘুমন্ত আদমের পাশ থেকে ঈশ্বর প্রথম নারীকে গড়েন। অনুবাদ সম্পর্কে একটি কথা: আদম ‘নিদ্রাগত হননি’, কারণ তাহলে তিনি মারা যেতেন। আর এখানে একটি পাঁজর নয়, বরং তাঁর

শরীরের এক পাশ বোঝানো হয়েছে।

এই অল্প কয়েকটি কথা থেকে আমরা কী শিখি? নারীকে পুরুষ থেকে নেওয়া হয়েছে, মাটি থেকে গড়া হয়নি। যেন তিনি তাঁর অনুরূপ হতে পারেন। তাঁকে আদমের পাশ থেকে নেওয়া হয়েছে, যেন পরে নারী হিসেবে – রূপক অর্থে বললে – তিনি সেই পাশটি আবার জুড়ে দেন। তাঁকে আদমের পাশ থেকে নেওয়া হয়েছে, যেন তিনি আদমের পাশে থেকে জীবনযাপন করেন। আদমের নিচে নয়, আদমের উপরে নয়। এক পরিপূরক হিসেবে, যিনি আদমকে পূর্ণ করেন এবং – জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি – নিশ্চয়ই নিজেকেও পূর্ণ করেন। একজন সমকক্ষ সহায় গড়ে উঠছেন। এটি হয়ে ওঠে হৃদয়ের বিষয়, এক ভালোবাসার সম্পর্ক – আদমের পাশ থেকেই তো তাঁর জন্ম।

আদম ও হবাকে একই সময়ে সৃষ্টি করা হয়নি, কারণ তাহলে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, এক হওয়া ও এক দেহ হওয়া এমন অর্থ ও গভীরতা পেত না।

ঈশ্বর যখন নারীকে পুরুষের কাছে নিয়ে আসেন, যেমন কনেকে বরের কাছে, সেই মুহূর্তগুলোতে আমি উপস্থিত থাকতে পারলে খুব ভালো লাগত:

> আদিপুস্তক ২:২৩-২৫ (জার্মান এলবারফেল্ডার বাইবেল থেকে অনূদিত) আর মানুষটি বললেন, এবার এ আমার হাড়ের হাড় ও মাংসের মাংস; একে নারী বলা হবে, কারণ একে নর থেকে নেওয়া হয়েছে। এই কারণে পুরুষ তার পিতা ও মাতাকে ত্যাগ করে তার স্ত্রীর প্রতি আসক্ত থাকবে, আর তারা এক দেহ হবে। আর তাঁরা দুজনেই, মানুষটি ও তাঁর স্ত্রী, নগ্ন ছিলেন, আর তাঁরা লজ্জা বোধ করতেন না।

এই মানুষটিকে দেখে আদম অভিভূত। তিনি বলে ওঠেন: অবশেষে আমার মতো একজন! তিনি তাঁর সমান, কিন্তু তাঁরই নারীরূপ – সেই 'নারী'। আদম এতটাই মুগ্ধ যে, ভবিষ্যতে পুরুষেরা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি আসক্ত থাকার জন্য নিজেদের ঘর ছেড়ে যাবে। উল্টোটা নয়। এখানে পুরুষেরাই নারীদের কাছে যায়। এক দেহ হওয়ার জন্য। আত্মা, প্রাণ ও দেহে এক একান্ত একতা হয়ে ওঠার জন্য। হৃদয়ের এক সহভাগিতা। বিবাহের চুক্তিতে বাঁধা এক দাম্পত্য সহভাগিতা। সবচেয়ে কাছের বন্ধু ও বান্ধবী হিসেবে। সমমূল্যের এক অংশীদারিতে। এক হওয়ার এমন সহভাগিতা কেবল দুজন সমমূল্যের ও সমমর্যাদার ব্যক্তির মধ্যেই গড়ে উঠতে পারে।

আদম প্রথম দৃষ্টিতেই তা বুঝতে পারেন। যিনি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি তাঁর সঙ্গে সমান মর্যাদায় মুখোমুখি হন। হয়তো শরীরের উচ্চতায় নয়, কিন্তু একজন ব্যক্তি হিসেবে নিজের সত্তায় অবশ্যই। অন্যজনকে জানার মধ্য দিয়েই তাঁরা নিজেদের প্রকৃতভাবে চিনতে পারেন।

পতনের আগে এক নিষ্কলুষ অবস্থায় দুজনের সাক্ষাৎ হয়। লজ্জাহীন তাঁদের নগ্নতা – আজ আর তা এভাবে নেই। সেই সময় কতদিন স্থায়ী হয়েছিল এবং কতদিন তা উপভোগ করা গিয়েছিল, আমরা জানি না। আমার ধারণা, সময়টা বেশ দীর্ঘই ছিল।

৪ সৃষ্টির শৃঙ্খলা – যদি থাকে, তবে কোনটি?

এখনই সময় সৃষ্টির শৃঙ্খলা ধারণাটিকে আরও কাছ থেকে দেখার। আর ঠিক এই জায়গাতেই: পরমদেশে। যেখানে পাপ তখনও ঘটেনি এবং পুরুষ ও নারী সম্পর্কে ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য তখনও চেনা যায়।

অনেক বোন ও ভাই এই ধারণাটি এমনভাবে ব্যবহার করেন, যেন এর অর্থ এই: আদমকে প্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তাই তিনি নেতৃত্বের ভূমিকায় আছেন। বড় দায়িত্ব নিয়ে। হবাকে আদমের সহায় হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছিল, যেন তিনি আদমের জন্যই থাকেন। এর থেকে সিদ্ধান্ত টানা হয় যে, নারী পুরুষের বশ্যতা স্বীকার করবেন। সব বিষয়ে – যেমন নতুন নিয়মও সাতবার বলে। আদম নাকি হবার উপরে মস্তক।

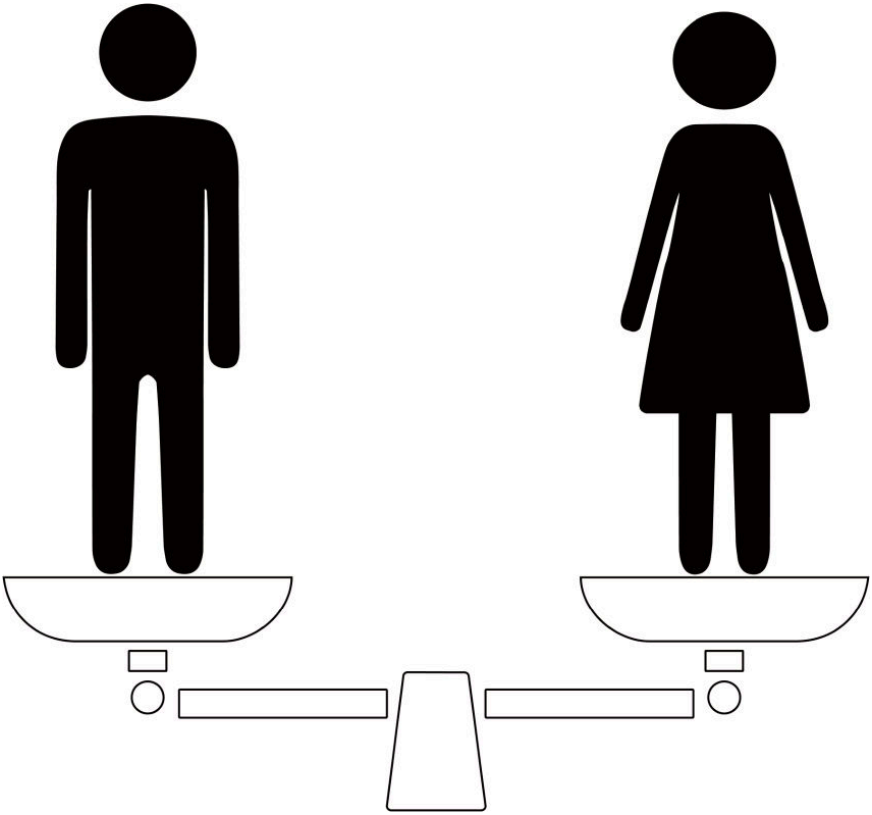
এই মত ব্যাপকভাবে প্রচলিত। সৃষ্টির ঘটনার এই ব্যাখ্যার প্রেরণা এসেছে নতুন নিয়মের অল্প কয়েকটি কথা থেকে, যেগুলো আমরা পরে দেখব।

প্রত্যেক পাঠিকা ও পাঠকের নিজের জন্য এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উচিত: **আপনি যদি কেবল আদিপুস্তক ১ ও ২ অধ্যায়ের লেখা দেখেন, সেখানে কি আদমের এমন কোনো নেতৃত্বের ভূমিকা পান, যা ঈশ্বর চেয়েছিলেন? অথবা হবার কোনো বশ্যতা?**

এই অংশগুলোতে কোনো স্তরবিন্যাস নেই, কোনো বশ্যতা বা নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব নেই। ব্যাপারটি ঠিক উল্টো, যেমন আমি উপরে বর্ণনা করেছি। আমাকে মেনে নিতে হলো যে, সৃষ্টির শৃঙ্খলা হিসেবে নারীর বশ্যতা বলে কিছু নেই। অর্থাৎ ঈশ্বরের চাওয়া কোনো স্তরভিত্তিক ধাপ, অবস্থান বা ভূমিকা নেই। **এটিকে এই অংশের মধ্যে ঢুকিয়ে পড়া হয়।**

ঠিক এই কারণেই আমি সৃষ্টির শৃঙ্খলার পক্ষে দাঁড়াই। অর্থাৎ পতনের আগের শৃঙ্খলার পক্ষে। তারপর থেকে আর সৃষ্টির **শৃঙ্খলা** নিয়ে কথা বলা যায় না। পতনের দিন থেকে এটি **সৃষ্টির বিশৃঙ্খলা। এই বিশৃঙ্খলাকে** আমাদের অনুসরণ করা উচিত নয়, বরং সুসমাচারের আলোয় ও শক্তিতে এর প্রতিরোধ করা উচিত।

আসলে "সৃষ্টির শৃঙ্খলা" কথাটি খুব কম ব্যবহার করা উচিত – যদি আদৌ করতে হয়। এই কথাটি এমন কিছুকে আটকে ফেলে পাকাপোক্ত করতে চায়, যা শেষ পর্যন্ত আমাদেরই ব্যাখ্যা।



৫ যা ঘটতে চলেছিল – কিন্তু ঈশ্বর কখনো চাননি

এবার আমরা তথাকথিত পতনের বর্ণনার দিকে তাকাই। সাপ হবাকে প্রলুব্ধ করে ফল নিতে, যা তিনি পরে আদমকেও দেন, আর আদমও তা খান। আগেই বলে রাখি: এই মর্মান্তিক ঘটনাগুলো থেকে সিদ্ধান্ত টানা হয় যে, নারী সহজে প্রলুব্ধ হন, এখানে নিজের ইচ্ছামতো উদ্যোগ নিয়েছেন এবং স্বামীকে অনুসরণ করেননি। ইহুদিরা আগেই, মণ্ডলীর পিতৃগণও, এবং আজ পর্যন্ত অনেকে এভাবে বা এর কাছাকাছি ব্যাখ্যা করেছেন এবং তা নারী জাতির উপরেই আরোপ করেছেন।

যদিও আমার মূল বিষয় পতনের সরাসরি পরিণতি, তবুও আমি পুরো অংশটি তুলে দিচ্ছি, যা ধাপে ধাপে ঘটনাগুলো বর্ণনা করে:

> আদিপুস্তক ৩:৪-৬ (জার্মান এলবারফেল্ডার বাইবেল থেকে অনূদিত) আর সাপ নারীকে বলল, তোমরা কোনোমতেই মরবে না, বরং ঈশ্বর জানেন, যেদিন তোমরা তা খাবে, সেদিন তোমাদের চোখ খুলে যাবে, আর তোমরা ঈশ্বরের মতো হবে, ভালো ও মন্দ জানবে। আর নারী দেখলেন যে, গাছটি খাবারের জন্য ভালো, চোখের জন্য লোভনীয়, আর বুদ্ধি দেওয়ার জন্য গাছটি কাম্য; আর তিনি তার ফল নিয়ে খেলেন, এবং তাঁর সঙ্গে থাকা তাঁর স্বামীকেও দিলেন, আর তিনি খেলেন।

এই গাছ থেকে না খাওয়ার নিষেধ আদম সরাসরি ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, হবা আসার আগেই (২:১৭)। তাই হবা সম্ভবত তা কেবল আদমের কাছ থেকেই শুনেছিলেন। এবার কথা-বলা সাপ তাঁকে প্রলুব্ধ করতে সফল হয়। স্পষ্টতই আদমের উপস্থিতিতে, যাঁর সবচেয়ে দেরি হলেও এখনই হস্তক্ষেপ করা উচিত ছিল। হবা যেমন দুর্বল হয়ে পড়েন এবং প্রলোভন ও প্রলুব্ধকরণের কাছে হার মানেন, তেমনি দুর্বল আদমও, যিনি কোনো বাধা না দিয়ে, কোনো কথা না বলে হবার হাত থেকে নিষিদ্ধ ফল নেন। দুজনেই ভুল আচরণ করেন, দুজনেই এক সর্বনাশা ভুল করেন এবং পাপ করেন। হবা যেখানে প্রলুব্ধ হন, আদম সেখানে কোনো প্রলোভন বা প্রতারণা ছাড়াই জেনেশুনে ঈশ্বরের নিষেধের বিরুদ্ধে পাপ করেন।

তারপর ঈশ্বর মানব-দম্পতি ও সাপের মুখোমুখি হন। কী ঘটেছে, সবাই তা জানে। ঈশ্বর প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞাসা করেন, কী ঘটেছিল। উত্তরগুলো অনেক কিছু প্রকাশ করে। ঈশ্বর এবার এই ক্রমে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলেন:

> আদম – হবা – সাপ – হবা – আদম।

> আদিপুস্তক ৩:১৩-১৫ (জার্মান এলবারফেল্ডার বাইবেল থেকে অনূদিত) আর মানুষটি বললেন, যে নারীকে তুমি আমার সঙ্গে দিয়েছ, সে-ই আমাকে গাছ থেকে দিয়েছে, আর আমি খেয়েছি। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর নারীকে বললেন, তুমি এ কী করলে! আর নারী বললেন, সাপ আমাকে প্রতারণা করেছে, আর আমি খেয়েছি। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর সাপকে বললেন, তুমি এ

> কাজ করেছ বলে সব গবাদি পশু ও মাঠের সব পশুর মধ্যে তুমি অভিশপ্ত হবে! তুমি পেটে ভর দিয়ে চলবে, আর জীবনের সব দিন ধুলো খাবে। আর আমি তোমার ও নারীর মধ্যে, এবং তোমার বংশ ও তার বংশের মধ্যে শত্রুতা স্থাপন করব; সে তোমার মাথা চূর্ণ করবে, আর তুমি তার গোড়ালি চূর্ণ করবে।

আদম নিজের দোষ সম্পর্কে সচেতন। হয়তো পুরোপুরি নন, কারণ তিনি সঙ্গে সঙ্গে দোষটা হবার ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। নিজে দায় এড়িয়ে যাওয়ার জন্য এভাবে নিজের স্ত্রীকে দায়ী করা করুণ ও কাপুরুষোচিত।[1] এমনকি পরোক্ষভাবে ঈশ্বরকেও দোষ দেওয়া হয়, যিনি তাঁকে এই নারীকে উপহার দিয়েছিলেন, যাঁকে পেয়ে তিনি এত সুখী ছিলেন। **হবা নন, আদমই আদেশটি সরাসরি ঈশ্বরের কাছ থেকে জানতেন, আর হবাকে তাঁরই জোর দিয়ে "না" বলা উচিত ছিল।**

হবা নিজের অপরাধ স্বীকার করেন। তিনি আদমকে দোষ দেন না, যিনি তাঁকে থামাননি, ঈশ্বরকেও দোষ দেন না, বরং সাপকে দোষ দেন। সাপ থেকে তিনি নিজেকে আলাদা করেন। সেই মারাত্মক পরিস্থিতিতে এটিই ছিল একমাত্র সঠিক কাজ। এখন তাঁর চোখ খুলে গিয়েছিল, আর তিনি এই শত্রুর বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। আদমের মতো নয়, যিনি এই কথোপকথনে নিজের স্ত্রীর পক্ষে দাঁড়ান না।

এই প্রতারণার জন্য সাপ চিরকাল অভিশপ্ত থাকবে এবং মাটিতে নামিয়ে দেওয়া হবে। হবা অনিষ্টের হোতাকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেন, আর তখন আসে এক মহৎ প্রতিজ্ঞা, যার ব্যাপ্তি তখনও বোঝা যায়নি। তাঁর বংশ – আপনি ঠিকই পড়ছেন – নারীর বংশ, কোনো পুরুষের নয়, সাপের মাথা চূর্ণ করবে।

এবার হবার জন্য, তারপর আদমের জন্যও পরিণতিগুলো বলা হয়। আমি জুরিখ বাইবেল (Zürcher Bibel, জার্মান বাইবেল অনুবাদ) থেকে উদ্ধৃত করছি, যা এখানে এলবারফেল্ডারের চেয়ে স্পষ্ট:

> আদিপুস্তক ৩:১৬ নারীকে তিনি বললেন: আমি তোমার কষ্ট অনেক বাড়িয়ে দেব এবং তোমার গর্ভধারণ বহুগুণ করব, যন্ত্রণার সঙ্গে তুমি সন্তান প্রসব করবে।
>
> তুমি তোমার স্বামীর প্রতি বাসনা করবে, আর সে তোমার উপরে কর্তৃত্ব করবে।

সাপ অভিশপ্ত হয়, কিন্তু **লঙ্ঘন সত্ত্বেও নারীর উপরে কোনো অভিশাপ আসে না**। ভাবার্থে এই শাস্তির বাক্যগুলোর অর্থ এই:

> আমি অবশ্যই বহুগুণ বাড়িয়ে দেব (১) মাঠে তোমার কঠোর পরিশ্রম এবং (২) তোমার গর্ভধারণ।
>
> কষ্টের সঙ্গে তুমি সন্তান প্রসব করবে।

1. আদম মনে হয় হবাকে অধীনস্থ বলে গণ্য করেননি, কারণ তেমন কারও কাছে তিনি সম্ভবত এভাবে হঠাৎ কাবু হতেন না।

> তোমার [প্রেমময়] বাসনা তোমার স্বামীর প্রতি [থাকবে]। কিন্তু সে [নিজের উপরে বিদ্রোহীভাবে কর্তৃত্ব করে এবং] তোমার উপরে কর্তৃত্ব করতে চাইবে।

কষ্ট ও কঠোর পরিশ্রম হলো চাষাবাদের কাজ। অভিশপ্ত মাটির কারণে সেখানে হবা আদমের সঙ্গে একসঙ্গে কষ্ট পান। অভিশাপ তাঁদের কোনো একজনের উপরে বা দুজনের উপরে আসে না, বরং মাটির উপরে। এর ফলে দুজনেই কষ্ট পাবেন।

কিন্তু আশা আছে। কারণ ঈশ্বর হবার গর্ভধারণ বাড়িয়ে দেবেন। তাই নিশ্চয়ই সেই বংশ আসবে, যা সাপকে বধ করবে। শুরুতেই অনুগ্রহ ঝলমল করে ওঠে, আর প্রলুব্ধ হওয়া সত্ত্বেও নারীই কেন্দ্রে থাকেন এবং আশার প্রতিশ্রুতি পান। আদম নন।

শাস্তি হিসেবে প্রসবে আরও বেশি যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য ঈশ্বর নারীর শরীরের গঠন বদলে দেন না। তখনও পর্যন্ত তাঁর কোনো সন্তানই হয়নি। কঠোর পরিশ্রমের কথাটি প্রসবযন্ত্রণা নিয়ে নয়, চাষাবাদ নিয়ে।

এবার আসি সেই অংশে, যেখানে স্বামীর সঙ্গে নারীর সম্পর্কের কথা আছে। এটি কোনো প্রতিজ্ঞা নয়, বরং এক মর্মান্তিক কথা। এটি অগণিত নারীর জন্য দুঃখ ও নিপীড়নের এক ইতিহাসের সূচনা করে, যার জন্য পুরুষদের লজ্জিত হতে হবে। **পুরুষ নারীর উপরে কর্তৃত্ব করবে – এটি ঈশ্বরের ইচ্ছা নয়, এটি পুরুষের পাপময় ও পতিত ইচ্ছা। এটাই এই কথার প্রকৃত অর্থ।** এটি এমন কোনো সৃষ্টির শৃঙ্খলা বর্ণনা করে না, যা মেনে চলতে হবে। এটি এক বিশৃঙ্খলা বর্ণনা করে। কারণ আদিপুস্তক ১ ও ২ অধ্যায়ের সুন্দর শৃঙ্খলা এখানে ভেঙে পড়েছে, চুরমার হয়ে গেছে।

যে কেউ বাইবেলের এই কথাকে নারীর বশ্যতার যুক্তি হিসেবে নেয়, সে সাপের পক্ষে দাঁড়ায়। সাপকে আগেই বলা হয়েছিল যে, হবা ও সাপের মধ্যে শত্রুতা থাকবে। সাপই ছিল আক্রমণকারী, যে পুরুষের কর্তৃত্বকে কাজে লাগিয়েছে এবং আজও কাজে লাগায়, যেখানে ও যেভাবে সম্ভব নারীর প্রতি বৈষম্য করার জন্য। কারণ নারীর কাছ থেকেই তো আসবেন সাপকে পরাজিতকারী। তাই নারীকে আক্রমণ করা ও দুর্বল করাই ছিল লক্ষ্য।

পুরুষ ও নারীকে আহ্বান করা হয়েছিল একসঙ্গে কর্তৃত্ব করতে। কিন্তু পুরুষ কর্তৃত্ব নিজের হাতে কেড়ে নেবে এবং নারীকে দুর্বলতর লিঙ্গ হিসেবে জোর করে বশীভূত করে নিজের সেবায় লাগাবে। এদনের বাইরে নারীর দুঃখজনক নিয়তি কী ছিল, তা সাধারণভাবে পিতৃতন্ত্র কথাটি ভালোভাবেই বর্ণনা করে। অল্প কিছু ব্যতিক্রম বাদে।

পারস্পরিক সহায়তা ও শক্তির, সমতার, সমানদের মধ্যে স্বীকৃতির এবং সমকক্ষ সঙ্গীকে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সাথি হিসেবে দেখার সেই আদি সম্পর্ক পরিণত হয়েছে এক ভয়াবহভাবে বিশৃঙ্খল ও আবেগের দিক থেকে অসম, ক্ষমতাভিত্তিক, প্রায়ই ভালোবাসাহীন সম্পর্কে। নারীর মনে স্বামীর প্রতি এবং তাঁর স্নেহ, আস্থা ও সুরক্ষার প্রতি বাসনা থাকবে, কিন্তু স্বামী তাঁর উপরে আধিপত্য খাটাবেন। এ এক ভয়ংকর ভাঙন ও পালাবদল।

লিঙ্গের এই লড়াই এরপর সব জাতির সংস্কৃতির প্রতিটি স্তরে দেখা দেবে। এটি কেবল তখনই সারতে পারে, যখন যে অনিষ্ট থেকে এর শুরু, তাকে শিকড় থেকে ধরা হয়।

শেষে আদমের প্রতি শাস্তির বাক্যগুলোর দিকে একবার তাকাই, যেগুলো সত্যিই অন্ধকারময়, আর শেষ পর্যন্ত নারীর ক্ষেত্রেও খাটে, যিনি তাঁর সঙ্গে নিজের জীবন ও বেঁচে থাকার লড়াই ভাগ করে নেন:

> আদিপুস্তক ৩:১৭-১৯ (জার্মান এলবারফেল্ডার বাইবেল থেকে অনূদিত) আর তিনি আদমকে বললেন, যেহেতু তুমি তোমার স্ত্রীর কথা শুনেছ এবং সেই গাছ থেকে খেয়েছ, যার বিষয়ে আমি তোমাকে আদেশ দিয়ে বলেছিলাম: তুমি তা থেকে খাবে না! – তাই তোমার কারণে মাটি অভিশপ্ত হোক: কঠোর পরিশ্রমে তুমি জীবনের সব দিন তা থেকে খাবে; আর তা তোমার জন্য কাঁটাগাছ ও শিয়ালকাঁটা উৎপন্ন করবে, আর তুমি মাঠের শাকসবজি খাবে।
>
> তুমি মুখের ঘামে তোমার রুটি খাবে, যতদিন না তুমি মাটিতে ফিরে যাও, কারণ তা থেকেই তোমাকে নেওয়া হয়েছে। কারণ তুমি ধুলো, আর ধুলোতেই তুমি ফিরে যাবে!

হবার কারণে নয়, আদমের কারণেই মাটি অভিশপ্ত হয়েছে। মনে হয়, তাঁর পাপই বড়। হবা ছিলেন বরং শিকার, আর আদম অপরাধী। নারীর বংশ, অর্থাৎ সেই নারীর এক উত্তরপুরুষ, যাঁকে আদমের সহায় হিসেবে দেওয়া হয়েছিল, দূর ভবিষ্যতেও আদমের জন্য সহায় হবেন: তাঁর বংশ (যীশু খ্রীষ্ট) পুনরুত্থানে আদমকে ধুলো থেকে টেনে জীবনে বের করে আনবেন। একদিন আমরা আদমের সঙ্গেও কথা বলতে পারব – যদি তখনও তিনি এ বিষয়ে আদৌ কথা বলতে চান।

পতনের বিবরণে, সৃষ্টির বিবরণগুলোতে নয়, প্রথমবারের মতো এক লিঙ্গের উপরে অন্য লিঙ্গের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হয়। আর এখানে কথাটি কোনো সহজাত শ্রেষ্ঠত্বের নয়, বরং এমন এক শ্রেষ্ঠত্বের, যা ক্ষমতা, শক্তি ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে অন্যায়ভাবে, ঈশ্বরের সৃষ্টির শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে খাটানো হয়। হবার প্রতি সৃষ্টিকর্তার কথা: "... স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকিবে; ও সে তোমার উপরে কর্তৃত্ব করিবে" (আদিপুস্তক ৩:১৬) – এর অর্থ হলো, আমাদের পাপময় মানব অবস্থায় পুরুষের প্রতি নারীর স্বাভাবিক বাসনাকে পুরুষ কাজে লাগায়, যেন নারীর উপরে কর্তৃত্ব খাটাতে ও নারীকে জোর করে বশীভূত করতে পারে। নারীকে জোর করে বশীভূত করা সত্যিই পুরুষের পতিত স্বভাবের এক লক্ষণ। খ্রীষ্টের জীবন ও কাজের অর্থ যদি পতনের পরিণতির উপরে বিজয় হয়, তাহলে এই ভাঙা সম্পর্কের উপর এবং নারীকে বশীভূত করা ও শোষণ করার উপর এর প্রভাব স্পষ্ট: তিনি নারীদের মুক্ত করবেন ও বাইরে বের করে আনবেন। আর ঠিক তা-ই ঘটল।

Hans-Jörg Ronsdorf 10.4.2021
পুরুষ ও নারীর জন্য বাইবেলভিত্তিক সৃষ্টির শৃঙ্খলা
আদিতে:
সৃষ্টির
উত্তম শৃঙ্খলা
আদিপুস্তক ১–২
সমমূল্যের,
একে অপরের
পরিপূরক,
স্তরবিন্যাস ছাড়া
পতনের পরে
(আদিপুস্তক ৩):
সৃষ্টির বিশৃঙ্খলা
যীশু পাপের উপরে
বিজয়ী হন।
পুনরুদ্ধার
শুরু হয়।
নতুন আকাশ
নতুন পৃথিবী
এদনের চেয়েও ভালো
প্রকাশিত বাক্য ২১ ও ২২
ঈশ্বরের সঙ্গে ও
পরস্পরের সঙ্গে
সম্প্রীতি
ঈশ্বরের সঙ্গে ও
পরস্পরের সঙ্গে সম্প্রীতি,
পাপে কলুষিত
ও ধ্বংসপ্রাপ্ত
প্রতিমাপূজা,
পিতৃতন্ত্র,
বর্ণভিত্তিকরণ,
দাসপ্রথা,
শোষণ ইত্যাদি
যীশুর মৃত্যু ও
পুনরুত্থানের মাধ্যমে
এক নতুন সৃষ্টি
শুরু হয়
সুসমাচার মানুষকে
বদলে দেয়; মণ্ডলীতে
পাপের সেই পরিণতিগুলো
দূর হয়, যেগুলোর
বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হবে।
খ্রীষ্টে, নতুন
সৃষ্টিতে, লিঙ্গের
আর কোনো ভূমিকা
নেই।

৬ যীশু, সেই খ্রীষ্ট, ও নারীরা

পতনের পরিণতির উপরে বিজয় কেবল প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মুক্তির কাজ দিয়েই শুরু হয় না। ২০০০ বছর আগে ইহুদি এবং গ্রিক-রোমান পরিবেশে তিনি যেভাবে নারীদের সঙ্গে আচরণ করেন ও তাঁদের মুখোমুখি হন, তা সত্যিই নারীদের জন্য এক নতুন কালগণনার সূচনা। এমন পুরুষ এর আগে কখনো ছিলেন না। মনে হতে পারে, যেন ঈশ্বর একজন পুরুষ হয়ে দেহে এসেছেন, পুরুষ জাতিকে দেখানোর জন্য যে, নারীদের সঙ্গে কেমন আচরণ করতে হয়।

তিনি ছিলেন সেই ভাববাদী, যিনি খিটখিটে না হয়ে তিরস্কার করতেন আর নিচু চোখে না দেখে প্রশংসা করতেন। তিনি তাঁদের প্রশ্ন, প্রয়োজন ও যুক্তিকে গুরুত্ব দিতেন। একেবারে সহজ-স্বাভাবিকভাবে তিনি তাঁদের সঙ্গে মিশতেন, আর কখনো তাঁদের নারীত্ব নিয়ে উপহাস করেননি। সেকালের সংস্কৃতিতে যা প্রচলিত ছিল, তার একেবারে বিপরীত – যেখানে মানুষ নারী হয়ে জন্মায়নি বলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিত। যখন নারী ছিল এক সম্পত্তি, যাকে তুচ্ছ কারণে ত্যাগপত্র দিয়ে আবার ঝেড়ে ফেলা যেত। শিশুদের মতো নারীদের ভাগ্যও ছিল কঠিন, যা নারীমুক্তি ও সমানাধিকারের এই যুগে আমাদের পশ্চিমা জগতে আমরা কল্পনাও করতে পারি না। মশীহ হবার কন্যাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। **তাঁর মধ্যে নারীর স্তরভিত্তিক বশ্যতার কোনো ইঙ্গিত নেই, ঠিক যেমন মণ্ডলীতে, বিবাহে বা সমাজে কথা বলা, নেতৃত্ব দেওয়া বা শিক্ষা দেওয়ার উপর কোনো নিষেধাজ্ঞাও নেই।**

একজন নারী জীবনের বাক্যকে জগতে জন্ম দিয়েছিলেন। বারোজনের মতো অনেক নারীও তাঁকে অনুসরণ করতেন ও তাঁর সেবা করতেন। ক্রুশের দিকে তাঁর সবচেয়ে কঠিন পথেও তাঁরা তাঁর পেছনে গিয়েছিলেন। শিষ্যেরা যখন অনেক আগেই পালিয়ে গিয়েছিলেন, তখনও তাঁরা ক্রুশের কাছে ছিলেন। পুনরুত্থিত জন সবার আগে একজন নারীকে দেখা দেন। শূন্য কবরের কাছে নারীরাই পুনরুত্থানের সাক্ষী হয়ে ওঠেন। সেই সব সংস্কৃতিতে নারীদের আইনি অর্থে সাক্ষী হওয়ার যোগ্য মনে করা হতো না। যীশু এই বৈষম্য সোজাসুজি তুলে দেন।

জায়গার অভাবে, যীশু যে বহু নারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আমরা কেবল তিনজনের কথা দেখব, যেন উপরের কথাগুলো যীশুর জীবনে খুঁজে পাই।

৬.১ যাকোবের কূপের ধারে শমরীয় নারী

যোহন ৪ অধ্যায় পড়ুন, আর এই কাহিনিতে ডুব দিন। দুপুরের তপ্ত রোদে, যখন কেউ জল তুলতে আসে না, কেবল তখনই তিনি কূপের কাছে যাওয়ার সাহস পান। আর সেখানে যীশু এই নারীর জন্য অপেক্ষা করেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি অনেকটা ঘুরপথে এসেছেন। পাঁচজন পুরুষ

তাঁকে ত্যাগ করেছিল; হাতবদল হতে হতে তিনি নিঃশেষ। বেঁচে থাকার জন্য তাঁকে ষষ্ঠ একজনের হাতে নিজেকে সঁপে দিতে হয়েছিল এবং কলঙ্কিত সুনাম নিয়ে বাঁচতে হচ্ছিল। সেকালে কোনো পুরুষ প্রকাশ্যে কোনো নারীর সঙ্গে কথা বলত না, আর একজন ইহুদি কোনো শমরীয় নারীর সঙ্গে তো নয়ই। কিন্তু যীশু তা করলেন! তিনি এই নারীর কাছে নিজেকে মশীহ হিসেবে প্রকাশ করেন। আগে তিনি কখনো তা করেননি। জীবন-জল ও আরাধনা নিয়ে তিনি তাঁর সঙ্গে এত দীর্ঘ সময় কথা বলেন, যত দীর্ঘ সময় আর কারও সঙ্গে কোনো ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়ে বলেননি। তিনি সময় দেন। তিনি তাঁর হৃদয় জয় করেন। তাঁর কাছে – নাসরতের সেই পুরুষের কাছে, শুখরের সেই পুরুষের কাছে – এই নারী মূল্যবান ছিলেন।

ঈশ্বরের সঙ্গে এই সাক্ষাতের পর সব ভয় ও লজ্জা থেকে মুক্ত হয়ে তিনি তাঁর গোটা গ্রামে সুসমাচার প্রচার করেন। অনেকে বিশ্বাস করে। যীশু ও শিষ্যেরা আরও দুই দিন সেখানে থাকেন।

পরে শমরিয়ার এই বিশ্বাসীরা গৃহমণ্ডলীতে মিলিত হবে। আর এই নারী নিশ্চয়ই সেই সমাবেশগুলোতে তাঁর কথা বলবেন – শুখরের সেই পুরুষের কথা, তাঁর মশীহের কথা ও তাঁর সঙ্গে নিজের অনন্য সাক্ষাতের কথা। আরাধনা সম্পর্কে যীশু তাঁকে যা বলেছিলেন, তিনি তা অন্যদের জানাবেন। কারণ সমবেত মণ্ডলীই সেই স্থান, যেখানে পিতার আরাধনা হয়। এই নারীও নিশ্চিতভাবেই আরাধনা করার জন্য মণ্ডলীতে কণ্ঠ তুলবেন। নইলে কেন যীশু ঠিক তাঁকেই, একজন নারীকে, আরাধনার কথা বুঝিয়ে বলবেন?

কেবল এই কাহিনিই নীরবতার আদেশকে অযৌক্তিক প্রমাণ করে।

৬.২ যীশুর চরণতলে – মার্থা ও মরিয়ম

কাহিনিটি বেশ পরিচিত (লূক ১০:৩৮-৪২): মার্থা যীশুর কাছে অভিযোগ করেন যে, তিনি যখন যীশু ও তাঁর শিষ্যদের জন্য খাবার তৈরি করছেন, তখন তাঁর বোন মরিয়ম তাঁকে সাহায্য করছেন না। মরিয়ম বরং যীশুর কাছে শেখার জন্য শিষ্যদের সঙ্গে তাঁর চরণতলে বসাই বেছে নেন। যীশু মরিয়মের পক্ষ নেন এবং বলেন যে, এটি এমনকি প্রয়োজনীয়, আর মরিয়ম উত্তম অংশটি বেছে নিয়েছেন, যা তাঁর কাছ থেকে নেওয়া হবে না। এর অর্থ কী? ঈশ্বরের রাজ্যে নারীরাও পুরুষদের মতো শিখবেন। রাব্বিদের বিদ্যালয়ে নারী প্রায় ছিলেনই না। যীশু অন্যভাবে করেন। পুরুষ ও নারী শেখার ক্ষেত্রে সমান সক্ষম, আর শেখানোর ক্ষেত্রেও সমান সক্ষম। এখানেও যীশু তাঁর সময়ের এক প্রথা ভাঙেন, যা আমাদের মধ্যে অনেক আগেই আর নেই। পরে পৌল তীমথিয়কে লেখেন (২ তীমথিয় ২:২), বহু সাক্ষীর সামনে তিনি যা শুনেছেন, তা যেন তিনি এমন মানুষদের – নারী ও পুরুষদের – হাতে তুলে দেন, যাঁরা অন্যদেরও শিক্ষা দিতে সক্ষম হবেন। এটি এই ঘটনার সঙ্গে চমৎকার মেলে: যীশু তাঁর শিক্ষা এমন মানুষদের, শিষ্যা ও শিষ্যদের হাতে তুলে দেন, যাঁরা এর ফলে পরে অন্যদের শিক্ষা দিতে সক্ষম হয়ে ওঠেন। **এটি স্পষ্টতই নারীদের জন্য শিক্ষাদানে কোনো সাধারণ নিষেধাজ্ঞার বিরোধী।**

যীশুর সঙ্গে সম্পর্কে লিঙ্গের আর কোনো ভূমিকা নেই। তিনি কারও মুখাপেক্ষা করতেন না (মথি ২২:১৬)। এর অর্থ এই নয় যে, লিঙ্গভেদ মুছে দেওয়া হয়েছে, বরং যীশু দুজনকেই সমানভাবে ও কোনো ভেদাভেদ ছাড়া মূল্য দেন: **যে কেহ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে, সেই আমার ভ্রাতা ও ভগিনী ও মাতা।** (মার্ক ৩:৩৩-৩৫)

৬.৩ মগ্দলীনী মরিয়ম, প্রেরিতদের প্রেরিত

৩য় শতাব্দীতে মণ্ডলীর পিতা রোমের হিপোলিটাস (Hippolyt von Rom) মগ্দলীনী মরিয়মকে এই নামে ডেকেছেন। কেন? পুনরুত্থানের পর যীশু সবার আগে তাঁরই সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। হয়তো তিনি যীশুকে অন্য সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। যীশু তাঁকে মন্দ আত্মার দখলের দাসত্ব ও দুর্দশা থেকে মুক্ত করেছিলেন। তখন থেকে তিনি যীশুকে অনুসরণ করতেন, আরও কয়েকজন নারীর সঙ্গে, যাঁদের যীশু সুস্থ করেছিলেন (লূক ৮:২-৩)। যীশু তাঁর হৃদয় জানতেন। আর কেবল তিনি, একজন নারী, বাগানে সেই অনন্য মুহূর্তের অভিজ্ঞতা পাবেন। আর স্পষ্টতই কেবল তাঁরই সৌভাগ্য হবে যীশুর মুখে এমন কথা শোনার, যা মানুষের কখনো শোনা সব কথাকে ছাড়িয়ে যায়:

> তুমি আমার ভ্রাতৃগণের কাছে গিয়া তাহাদিগকে বল, যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, এবং আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর, তাঁহার নিকটে আমি ঊর্দ্ধে যাই (যোহন ২০:১৭)।

এভাবে তিনি হয়ে ওঠেন শিষ্যদের কাছে প্রেরিত দূত, নারী প্রেরিত। এক সম্মানসূচক উপাধি, যা তাঁর সঙ্গে মানায়, যদিও তা আনুষ্ঠানিক নয়। কোনো পুরুষকে নয়, বারোজনের কাউকে নয়, এই বার্তা দেওয়া হয়। একজন নারীকে তা দেওয়া হয়, এক বিশ্বস্ত সাক্ষী হিসেবে। **সমাবেশগুলোতেও কি তিনি বারবার এই সাক্ষাতের কথা বলেননি?**

৭ কনেরূপী মণ্ডলী ও নারীদের পরিচর্যা

সব বিশ্বাসী, যীশুকে স্বীকারকারী সবাই, পুরুষ ও নারী সমানভাবে, একসঙ্গে মেষশাবকের কনে।

সৃষ্টির বিবরণে এটি স্পষ্ট যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী আদম ও হবা একে অপরের উপরে কর্তৃত্ব করেন না, বরং একসঙ্গে ও পাশাপাশি ঈশ্বরের দেওয়া সৃষ্টির দায়িত্ব পালন করেন। একজনের উপরে অন্যজনের কোনো বিশেষ সুবিধা নেই, কোনো এক লিঙ্গের উপরে কোনো সীমাবদ্ধতাও নেই। ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুযায়ী বিবাহ এমনই, আর জীবনের সব ক্ষেত্রে দুই লিঙ্গের পারস্পরিক আচরণও মূলত এমনই।

পতন এই ছবিকে স্থায়ীভাবে ভেঙে দিয়েছে: ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে, পুরুষ এখন – অবশ্যই কিছু ব্যতিক্রম বাদে – নারীর উপরে কর্তৃত্ব করতে চায়। পাপের ফলেই প্রথম নারীকে অধীন করা হয়। হ্যাঁ, জোর করে বশীভূত করা হয় এবং পেছনে ঠেলে দেওয়া হয়। প্রকাশ্য জীবন পুরুষের জন্য সংরক্ষিত। নারী আবার নিজের অবস্থা থেকে সবচেয়ে ভালোটা বের করে আনার জন্য নিজের কৌশল গড়ে তুলবে।

কিন্তু মণ্ডলীতে কেমন, ঈশ্বরের রাজ্যে কেমন? সেখানেও কি অসমতা, টানাপোড়েন ও একতরফা বশ্যতার এই পাপময় ধাঁচ চলতে থাকবে? পৌল ও পিতরের পত্রগুলোতে এমন কিছু কথা আছে, যেগুলো কেউ এভাবে বুঝতে চাইলে এভাবে বোঝা যায়। কিন্তু আসুন, আমরা আগে পৌলের দিকে তাকাই।

৭.১ পৌল ও তাঁর নারী সহকর্মীরা

বাইবেলের দুটি, হয়তো তিনটি অংশ ভাসা-ভাসাভাবে বুঝলে পৌলকে **নারীবিদ্বেষী** বলে মনে হয়। কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে বরং উল্টোটাই সত্য। তাঁর চূড়ান্ত আদর্শ যীশুর মতো তিনিও নারীদের সঙ্গে বৈপ্লবিক আচরণ করেন, অর্থাৎ পুরুষদের মতোই সমান অধিকার দিয়ে। তিনি ছিলেন **নারীদের বন্ধু**। সত্যিই তিনি কোনো ভেদাভেদ করেন না। প্রভুতে বোনদের সম্পর্কে তিনি যে স্বাভাবিকতায় লেখেন, তা চোখে পড়ার মতো। অক্লান্ত প্রেরিত ও মিশনারি পৌলের কাজ বহু নারীর দ্বারা ঘেরা ও তাঁদের সঙ্গে জালের মতো যুক্ত ছিল। তাঁরা তাঁর মিশনের অংশ ছিলেন, আর শিকলের আংটার মতো অপরিহার্য সহকর্মী ছিলেন। নারীরা পেছনের সারির কোনো ফাইফরমাশ খাটা লোক ছিলেন না; তাঁরা বিশ্বস্ততায় অনন্য ছিলেন এবং পৌলের মতোই বাক্যের সেবা করতেন। আমরা এমন অনেক নারীর নাম বলতে পারি; আমি তিনজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছি। রোমীয় ১৬ অধ্যায়ে ২৯ জনের নাম আছে, তাঁদের অন্তত ১০ জন নারী, যাঁদের পরিচর্যা ও নিবেদনকে পৌল সম্মান জানান – পুরুষদের চেয়েও বেশি। সেখান থেকেই আমরা শুরু করি।

৭.১.১ ফৈবী – ডিকন, নেত্রী ও পত্রবাহিকা

রোমীয় ১৬ অধ্যায়ের শুভেচ্ছাবাণী শুরু হয় ফৈবীকে দিয়ে। যথেষ্ট কারণেই। তাঁরই ছিল সেই আস্থা ও সামর্থ্য, পৌলের হয়তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পত্রটি রোমে নিয়ে যাওয়ার। প্রচলিত রীতি ছিল, পত্রবাহক পত্রটি কেবল পড়ে শোনাতেন না, এ নিয়ে প্রশ্নেরও উত্তর দিতেন। পৌল করিন্থে এই পত্র লিখেছিলেন; তিনি নিজে ফৈবীকে শিক্ষা দিয়েছিলেন ও পত্রটির বিষয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তাই ফৈবী এই দায়িত্ব পালনে সক্ষম ছিলেন। তিনি রোমের বিভিন্ন গৃহমণ্ডলীতে যেতেন, পত্রটি পড়ে শোনাতেন এবং যেখানে প্রশ্ন উঠত, সেখানে ব্যাখ্যা করতেন।

তিনি নিজে ছিলেন একজন সেবিকা, করিন্থের পূর্ব বন্দর কিংক্রিয়ার গৃহমণ্ডলীর একজন ডিকন। তার চেয়েও বড় কথা, তিনি হয়তো এই মণ্ডলীর নেত্রী ছিলেন। জার্মান অনুবাদগুলো অনুসারে পৌল তাঁকে বলেন সহায়তাকারিণী, সাহায্য বা অবলম্বন। কিন্তু শব্দটির আসল অর্থ পরিচালিকা (গ্রিক: prostatis), আর এটি নেতৃত্বের কোনো পদের দিকে, যেমন এই গৃহমণ্ডলীতে, ইঙ্গিত করে। এটি কল্পনা করা কঠিন যে, কিংক্রিয়ার গৃহমণ্ডলীতে দায়িত্বপূর্ণ পদে থাকা ফৈবীকে পৌল এই দায়িত্ব দেবেন, অথচ সাধারণভাবে মণ্ডলীতে নারীদের কথা বলা, শিক্ষা দেওয়া ও নেতৃত্ব দেওয়া নিষেধ করবেন।

অন্যদিকে আমরা এই পদগুলোর মধ্যে বেশি কিছু ঢুকিয়ে পড়তেও চাই না; কিন্তু এমনভাবে ব্যাখ্যা করাও ঠিক নয়, যেন তিনি কেবল এক সাধারণ ডাকপিয়নের কাজ করেছিলেন।

৭.১.২ এক আদর্শ দম্পতি: প্রিষ্কা ও আক্কিলা

সবচেয়ে বেশিবার উল্লিখিত দম্পতি প্রিষ্কা ও আক্কিলা হয়তো পৌলের মিশনের কাজে তাঁর সবচেয়ে দীর্ঘদিনের ও সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। দম্পতিদের ক্ষেত্রে সবসময় স্বামীর নাম আগে বলা হলেও নতুন নিয়ম স্ত্রী প্রিষ্কার নাম চারবার (ছয়বার উল্লেখের মধ্যে) আগে বলে। কেন? কারণ পরিচর্যায় তিনিই আগে থাকতেন ও নেতৃত্ব দিতেন। হয়তো তিনি তাঁর স্বামীর চেয়ে বেশি প্রতিভাবান ছিলেন। আর তবুও দুজনে দলের সঙ্গী হিসেবে সমমূল্যের ও সমমর্যাদার হয়ে একতায় একসঙ্গে কাজ করতেন। প্রত্যেকে অন্যজনের শক্তি ও দুর্বলতা জানতেন। নারী হিসেবে প্রিষ্কা কৌশলগত দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন, কারণ নারীদের কাছে সুসমাচার সাধারণত নারীরাই পৌঁছে দিতেন, পুরুষেরা নন। দুজনে মিলে, প্রিষ্কা সামনে থেকে, আপল্লোকে শিক্ষা দিয়েছিলেন (প্রেরিত ১৮:২৬)। পৌল নিজে তাঁদের শিক্ষা দিয়েছিলেন; একসঙ্গে তাঁবু তৈরির বহু ঘণ্টায় প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্য দিয়ে তাঁরা প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন। তাই দুজনেই অন্যদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় প্রিষ্কাকেই, একজন নারীকে। তাঁর স্বামী সমর্থন দিয়ে তাঁর পেছনে, দ্বিতীয় সারিতে ছিলেন, কিন্তু এতে কোনো স্তরবিন্যাস তৈরি হতে পারেনি। এটা কল্পনাও

করা যায় না যে, পৌল নারীদের জন্য শিক্ষাদানে সাধারণ নিষেধাজ্ঞা দিতেন, যখন প্রিষ্কা নিজেই আপল্লোকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন, আর নিশ্চয়ই আরও অনেককে। এই দম্পতি সব দম্পতির জন্য এক আদর্শ।

৭.১.৩ যূনিয়া – সম্মানিত নারী প্রেরিত

পৌল আরও এক মিশনারি দম্পতিকে বিশেষ সম্মান দেন: আন্দ্রনীক ও যূনিয়া। দুজনকেই প্রেরিত বলা হয়েছে (রোমীয় ১৬:৭)। নতুন নিয়মের প্রথম যুগের ব্যাখ্যাকারীরা, মণ্ডলীর পিতৃগণ, যূনিয়ার কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে বলেন। যোহন ক্রিসোস্টম (Johannes Chrysostomos) (৩৪৪-৪০৭ খ্রীষ্টাব্দ) যূনিয়া সম্পর্কে লেখেন: "প্রেরিত হওয়া এক মহৎ বিষয়। কিন্তু প্রেরিতদের মধ্যে বিখ্যাত – ভেবে দেখুন, এটি কত বড় প্রশংসা। এই নারীর প্রজ্ঞা কত মহান ছিল যে, তাঁকে প্রেরিত উপাধির যোগ্য বলে গণ্য করা হয়েছিল।"

পুরুষ-প্রধান গির্জা ও মণ্ডলীর জগতের পক্ষে এটি মেনে নেওয়া কঠিন যে, প্রেরিত পৌল একজন নারীকে নারী প্রেরিত বলেছেন। তাই কিছু অনুবাদ যূনিয়াকে যূনিয়াস বানিয়ে দেয়, অর্থাৎ একটি পুরুষের নাম। যা হওয়া উচিত নয়, তা হতেও পারে না। কিন্তু গবেষণা ইতিমধ্যে বারবার নিশ্চিত করেছে যে, এটি একটি নারীর নাম।

কোন অর্থে তাঁরা দুজন প্রেরিত ছিলেন, তা খোলা প্রশ্ন। হয়তো কোনো মণ্ডলী তাঁদের পাঠিয়েছিল। হয়তো তাঁরা মণ্ডলী স্থাপনের প্রেরিতীয় পরিচর্যা করতেন। অথবা তাঁরা এই অর্থে প্রেরিত ছিলেন যে, তাঁরা সেই দলের ছিলেন, যাঁরা পুনরুত্থিত জনকে দেখেছিলেন, আর এখন প্যালেস্টাইনের বাইরে ঈশ্বরের রাজ্যের কাজ করছিলেন।

এখানেও আমি একই কথা আবার বলি: **নারীদের জন্য কথা বলা, শিক্ষা দেওয়া ও নেতৃত্ব দেওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা একজন নারী প্রেরিতের পক্ষে মেনে চলা প্রায় অসম্ভব।** তাঁরা দুজনেই কিছু সময় পৌলের সঙ্গে কারাগারে ছিলেন – এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, তাঁরা দুজনেই সম্ভবত প্রকাশ্যেও সুসমাচার প্রচার করেছিলেন।

৮ বোনদের জন্য কি নীরবতার আদেশ আছে?

পৌলের চারপাশের এই তিনজন এবং অন্য নারীদের দেখলে কারও মনে এই চিন্তা আসবে না যে, সমবেত গৃহমণ্ডলীতে – অর্থাৎ আজ যাকে আমরা উপাসনা বলি – নারীদের নীরব থাকতে হবে। নতুন নিয়মের অন্য কোথাও এমন কোনো ইঙ্গিত নেই যে, এমন হওয়া উচিত ছিল বা এমনটা পালন করা হতো। **এমন কিছু থাকতে পারে, এই ধারণাই আমাদের মাথায় আসত না।**

কেবল একটি ছোট অংশ ছাড়া, যাকে এভাবে বুঝতেই হয়। কথা হচ্ছে ১ করিন্থীয় ১৪:৩৪-৩৫ পদের এই অংশ নিয়ে:

> নারীরা সমাবেশে নীরব থাকুক, কারণ তাদের কথা বলার অনুমতি নেই, বরং তারা বশ্যতা স্বীকার করুক, যেমন ব্যবস্থাও বলে।
>
> কিন্তু তারা যদি কিছু শিখতে চায়, তবে ঘরে নিজেদের স্বামীদের জিজ্ঞাসা করুক; কারণ সমাবেশে কথা বলা নারীর পক্ষে লজ্জার বিষয়।

এটিকে প্রভুর সরাসরি ও দ্ব্যর্থহীন আদেশ হিসেবে বোঝা যেতে পারে। কিন্তু এ নিয়ে যুক্তিসংগত সন্দেহ আছে। নারীমুক্তিবাদী বা ফেমিনিস্ট মনোভাবের কারণে নয়, বরং শাস্ত্র নিজেই এর ভিত্তি।

১১:৫ পদে পৌল এমন নারীদের কথা বলেন, যাঁরা প্রার্থনা করেন ও ভাববাণী বলেন (যোয়েল ২:২৮; প্রেরিত ২:১৭-এর সঙ্গে মিল রেখে)। তাঁরা তা কোথায় করেন? কেউ বলেন, সমাবেশে; অন্যেরা বলেন, কেবল সমাবেশের বাইরে, যেমনটা ১৪ অধ্যায়ের এই ৩৪-৩৫ পদ নিশ্চিত করছে বলে মনে হয়। কিন্তু পৌলের কাছে প্রার্থনা ও ভাববাণী বলা **প্রধানত** সমবেত হওয়ার সময়েই ঘটে। ১৪ অধ্যায়ে তিনি এভাবেই তা বর্ণনা করেন। সেখানে পৌলের কাছে এটি স্বাভাবিক যে, নারীরাও অংশ নেন। তিনি একাধিকবার এভাবে কথা বলেন।

- ৫ পদ: আমি চাই, তোমরা সকলে বিশেষ বিশেষ ভাষায় কথা বলো, তার চেয়েও বেশি, যেন ভাববাণী বলো!
- ১২ পদ: চেষ্টা করো, যেন তোমরা (সকলে) সমাবেশকে গেঁথে তোলার জন্য উপচে পড়ো।
- ২৩ পদ: তাই যদি সমস্ত সমাবেশ এক জায়গায় মিলিত হয় এবং সকলে বিশেষ বিশেষ ভাষায় কথা বলে ...
- ২৬ পদ: তাহলে কী, ভাইয়েরা? তোমরা যখন মিলিত হও, তখন তোমাদের প্রত্যেকের কাছে একটি গীত থাকে, একটি শিক্ষা থাকে, একটি প্রকাশ থাকে, একটি ভাষা থাকে, একটি অর্থব্যাখ্যা থাকে; সবকিছু গেঁথে তোলার জন্য হোক।

"ভাইয়েরা" (গ্রিক: adelphoi) বলতে ভাই-বোনদের, অর্থাৎ ভাইয়েরা **ও** বোনেরা উভয়কে বোঝানো হয়েছে – অন্য বহু পদের মতোই, যেগুলোকে আমরা কেবল পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে পারি না (১ করিন্থীয় পত্রে শব্দটি ২৭ বার এসেছে, আর প্রায় সবসময়ই ভাইয়েরা **ও** বোনেরা বোঝানো হয়েছে)।

- ৩১ পদ: কারণ তোমরা এক এক করে সকলেই ভাববাণী বলতে পারো, যেন সকলে শেখে ও সকলে সান্ত্বনা পায়।

যে খ্রীষ্টানের কাছে বাইবেল ঈশ্বরের বাক্য, তাঁর কাছে বাইবেলের লেখার মধ্যে কোনো স্ববিরোধ থাকতে পারে না। কিন্তু ৩৪-৩৫ পদ বেশিরভাগ পাঠকের কাছে লেখার মধ্যে এক বহিরাগত বস্তুর মতো মনে হয়। এর সঙ্গে প্রথমত বাইবেল-সমালোচনা বা ভুল মানসিকতার কোনো সম্পর্ক নেই, বরং সাধারণ বুদ্ধির সম্পর্ক আছে, যা এখানে ঠিকভাবেই এক স্ববিরোধ লক্ষ করে।

আমরা কীভাবে এই স্ববিরোধের সমাধান করব? যে পদগুলোতে নারীরা প্রার্থনা করেন ও ভাববাণী বলেন, এবং সবাইকে তা করতে উৎসাহ দেওয়া হয়, সেগুলোর আলোকে, আর পৌলের লেখায় নারীদের পরিচর্যার বর্ণনার আলোকেও, এখানে কোনো সর্বজনীন ও সব যুগের জন্য প্রযোজ্য নীরবতার আদেশ বোঝানো অসম্ভব। অন্য কথায়: এই অংশের এমন এক ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রয়োজন, যা যুক্তিসংগত ও স্ববিরোধহীন অর্থ দেয়। বহু ব্যাখ্যা – বা আরও ঠিকভাবে বললে, ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা – আছে, কারণ বেশিরভাগ ব্যাখ্যাকারই স্ববিরোধটি লক্ষ করেছেন। আমি এখানে অল্প কয়েকটির কথা বলছি, তারপর একটি ভিন্ন সমাধানের প্রস্তাব দেব।

৮.১ ভাববাণীর বিচার

করিন্থের নারীদের যদি ঘরে নিজেদের স্বামীদের জিজ্ঞাসা করতে হয়, তাহলে এর অর্থ, তাঁদের প্রশ্ন ছিল, আর সম্ভবত তাঁরা ভালোভাবে শিক্ষা পাননি। তাঁদের জ্ঞানের অভাব ছিল। তাই হয় মণ্ডলীর সভাগুলোতে তাঁরা খুব বেশি মাঝখানে প্রশ্ন করতেন, নয়তো এমন কথা বলতেন, যা মোটেই জ্ঞানপূর্ণ ছিল না – তাও এমনভাবে, যা পৌল এখানে যাকে বশ্যতা বলেন, তার উল্টো। এতে তাঁরা বিঘ্ন ঘটাতেন, আর বিশৃঙ্খলা দেখা দিত, যা শান্তির ঈশ্বরের সঙ্গে খাপ খায় না। তাহলে প্রশ্নটি এই নয় যে, তাঁরা কিছু বলেন কি না, বরং তাঁরা কীভাবে ও কী বলতেন।

এর অর্থ এও হতে পারে যে, নারীদের তাঁদের স্বামীদের বা সব পুরুষের ভাববাণীমূলক কথার বিচার (২৯ পদ) থেকে বাদ রাখা হয়েছিল, কারণ সেকালের সংস্কৃতিতে স্ত্রী যদি প্রকাশ্য সমালোচনা করে স্বামীকে অপদস্থ করতেন, তা ছিল লজ্জার বিষয়।

৮.২ ৩৪ ও ৩৫ পদ কি একটি উদ্ধৃতি?

এমন হতে পারে যে, পৌল এখানে কিছু করিন্থীয়ের কথা উদ্ধৃত করছেন, তাঁদের খণ্ডন করার জন্য। তাহলে কথাগুলো পৌলের নয়। এটি সাধারণভাবে স্বীকৃত যে, ১ করিন্থীয় পত্রে পৌল একাধিকবার একটি পত্র থেকে – কখনো স্বাধীনভাবে, কখনো হুবহু – উদ্ধৃতি দেন, এই জায়গাগুলোতে: ৬:১২-১৩; ৭:১; ৮:১, ৪; ১০:২৩; ১৫:১২। প্রতিটি উদ্ধৃতিকে সবসময় উদ্ধৃতি বলে চিহ্নিত করা হয় না; প্রসঙ্গ থেকেই বোঝা যায়, এটি উদ্ধৃতি কি না। মুখে মুখে বা কোনো পত্রের মাধ্যমে পৌল জানতে পেরেছিলেন যে, করিন্থে কিছু পুরুষ নারীদের জন্য এমন নীরবতার আদেশ দাবি করছিল। গ্রিক ও রোমানদের সেকালের সংস্কৃতিতে নারীদের নীরব থাকার এমন দাবি ছিল।

ব্যবস্থার দোহাই দেওয়াটা অদ্ভুত, কারণ মোশির ব্যবস্থায় নীরবতার কোনো আদেশ নেই, বশ্যতারও কোনো আদেশ নেই। পুরাতন নিয়মে নারীদের বশ্যতা ও নীরবতার কথা আমরা কোথাও পাই না, সৃষ্টির কাহিনিতেও নয়। পৌলই স্পষ্টভাবে দেখান যে, মোশির ব্যবস্থা খ্রীষ্টানদের জন্য আর জীবনের নিয়ম নয়, উপাসনার রূপ নির্ধারণে তো নয়ই। তাই এখানে হয়তো কোনো ইহুদি, গ্রিক বা রোমান ব্যাখ্যা বা নিয়মের কথা বলা হয়েছে, যার দোহাই এমন লোকেরা দিত – ঈশ্বরের ব্যবস্থা নয়, খ্রীষ্টের ব্যবস্থাও নয়। এটি এই মতকে সমর্থন করে যে, এখানে একটি উদ্ধৃতি আছে।

যদি এটি উদ্ধৃতি হয়, তাহলে ৩৬ পদে পৌল এই অগ্রহণযোগ্য দাবির বিরুদ্ধে স্পষ্টভাবে, প্রায় ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিক্রিয়া দেখান। জার্মান ভাষায় এবং বাইবেলের অনুবাদগুলোতে এটি এভাবে বোঝা যায় না। তাঁর প্রতিক্রিয়াকে এভাবে প্রকাশ করা যায়: “কী?” অথবা “বাজে কথা!” অথবা: নারীরা সমাবেশে নীরব থাকবে – “কোনোমতেই না”। এটি হতো পৌলের এক জোরালো আপত্তি ও প্রতিবাদ।

৮.৩ ৩৪ ও ৩৫ পদ কি পরে যোগ করা?

পদগুলো অচেনা শোনায়, আর এতে এমন বিষয় আছে, যা পৌলের লেখায় অন্য কোথাও এভাবে পাওয়া যায় না। ইতিমধ্যে প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলো থেকে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যে, এই পদগুলো নকলকারীদের সংযোজন।

আমাদের যদি কেবল ভেতরের সন্দেহ থাকত – অর্থাৎ পরস্পরবিরোধী বা দুর্বোধ্য কথা – তাহলে আমাদের এখনও স্পষ্টতার জন্য অপেক্ষা করতে হতো। কিন্তু এখন পাণ্ডুলিপির এমন প্রমাণ আছে, যা এটি নিশ্চিত করছে বলে মনে হয়।

প্রথম যুক্তিসংগত সন্দেহ জাগে এই তথ্য থেকে যে, এই দুটি পদ পাণ্ডুলিপিগুলোতে একাধিকবার ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় আছে। একবার সেখানে, যেখানে আমাদের বাইবেলে সাধারণত থাকে, অর্থাৎ ৩৩ পদের পরে। **কিন্তু অন্যগুলোতে সেগুলো ৪০ পদের পরে।** সবচেয়ে সহজ ব্যাখ্যা এই: কেউ একজন কোনো কোডেক্সের মার্জিনে সেগুলো লিখেছিল। পরের নকলকারী এই মার্জিন-টীকাকে মূল লেখায় তুলে আনেন, আর কোন জায়গায় বসাবেন, তা তিনি ঠিক করেন। সবসময় একই জায়গা হলে কিছুই চোখে পড়ত না।

এই প্রাথমিক সন্দেহ নিশ্চিত হয় ৪র্থ শতাব্দীর গুরুত্বপূর্ণ **কোডেক্স ভাটিকানুস** (Codex Vaticanus) পাণ্ডুলিপিতে এক আবিষ্কারের মাধ্যমে। নতুন নিয়মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বড় পাণ্ডুলিপিগুলোর একটি। এই লেখায় সত্যিই এই পদগুলো এবং আরও কয়েকটি পদ পরবর্তী সংযোজন হিসেবে চিহ্নিত করা আছে।

৬ষ্ঠ শতাব্দীর কোডেক্স ফুলডেনসিসেও (Codex Fuldensis) দুটি পাঠই আছে; এর মধ্যে যে পাঠে ৩৪ ও ৩৫ পদ **নেই**, সেটিকে সংশোধন বলে ধরা হয়।

তাহলে দুটি কোডেক্সের (পাণ্ডুলিপির) দুটি মূল উৎসেই এই পদগুলো ছিল না!

তাহলে সেগুলো পৌলের কাছ থেকেও আসেনি। পৌলের লেখা না হলে তা অনুপ্রাণিতও নয়, সোজা কথায় ভুল। সেই ভুল বীজের মতো, যা ভালো বীজের মধ্যে বোনা হয়েছিল এবং আজও বেড়ে চলেছে। এই দুটি পদের প্রভাব দেখলে – নারীদের জন্য সেগুলো কী ঘটিয়েছে, আর এই কথাগুলো কত চোখের জল, বিবাদ ও বিভেদ এনেছে – এই তত্ত্বের সন্দেহটি বেশ বোঝা যায়।

এই পদগুলো বাদ দিলে ১ করিন্থীয় ১৪ অধ্যায়ের শেষ অংশ আবার সুসংগত হয় এবং চিন্তার এক স্পষ্ট ধারা পাওয়া যায়।

যে নারীরা নীরবতার আদেশকে আক্ষরিকভাবে গুরুত্ব দেন, তাঁরা তো একসঙ্গে প্রশংসাগানও গাইতে পারতেন না (১৪:১৫), আমেনও বলতে পারতেন না (১৪:১৬)। কিন্তু যেখানে নীরবতার আদেশকে এভাবে বোঝা হয়, সেখানেও তাঁরা তা করেন। এটি অসংগত, আর দেখায় যে, এই ব্যাখ্যা অনুসারে এমনকি পৌলও নিজের বিরোধিতা করতেন। ইহুদিদের সমাজগৃহে হয়তো এমন ছিল, কিন্তু পুনরুত্থিত জনের সমাবেশে নয়।

আমার কাছে এটা মর্মান্তিক যে, পুরুষেরা পৌলের এই কথাকে অধ্যায়ের, পত্রের ও নতুন নিয়মের প্রসঙ্গের কোনো তোয়াক্কা না করে নারীদের প্রতিকূলে এই ব্যাখ্যা বেছে নিয়েছেন এবং এভাবে সব নারীকে নীরব থাকতে বাধ্য করেছেন। এর মাধ্যমে তাঁরা সভাগুলোকে অনেক আত্মিক সম্পদ থেকে বঞ্চিত করেন, এমনকি হয়তো প্রভুর কণ্ঠস্বর থেকেও। কারণ বোনেরাও তো ঈশ্বরের আত্মা ও আত্মার বরদান পেয়েছেন। এ কি হতে পারে যে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশে খ্রীষ্টের অর্ধেক দেহকে নীরব থাকতে হবে? অথবা আত্মা কেবল পুরুষদের মাধ্যমেই কাজ করেন?

আমি শিখেছি, সবসময় শাস্ত্রকে শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে এবং এমন সমান্তরাল অংশ খুঁজতে, যা কোনো ব্যাখ্যাকে সমর্থন ও নিশ্চিত করে। নারীদের জন্য নীরবতার আদেশ রয়েছে, পরোক্ষভাবে তা আগে থেকেই ধরে নেয়, বা তা আদেশ করে – এমন আর কোনো অংশ কি আছে? না।

সব মিলিয়ে কেবল এমন কথাই আছে, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নারীদের অংশগ্রহণ দেখায় ও অনুমান করতে দেয়। নীরবতার আদেশ একটিমাত্র অংশ। তাও অস্বাভাবিক; তাই হয় এটি এমন কথা বলার দিকে ইঙ্গিত করে, যা অনুপযুক্ত এবং সেজন্য নিষিদ্ধ, নয়তো এটি পৌলের নয় – অননুমোদিত সংযোজন বা উদ্ধৃতি হিসেবে। তাহলে এটি কোনো প্রেরিতীয় নির্দেশ নয়, বরং ঠিক তার উল্টো।

এত সামান্য প্রমাণের ভিত্তিতে বোনদের প্রতিকূলে সিদ্ধান্ত নিয়ে খ্রীষ্টানদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশে সারা জীবন তাঁদের কথা বলা নিষেধ করার কথা কারও মাথায় আসে কীভাবে? আর সেই সঙ্গে এ বিষয়ে কথা উঠলে চরম আবেগপ্রবণ ও উত্তেজিত হয়ে প্রতিক্রিয়া দেখানো? যাঁরা এর উপর জোর দেন, সেই পুরুষদের কাছে কি আমি আন্তরিকভাবে অনুরোধ করতে পারি, একবার বোনদের অবস্থানে নিজেকে রেখে দেখতে? অর্থাৎ মাত্র দুটি বাক্য থেকে এমন সুদূরপ্রসারী, কঠোর ও ব্যাখ্যাতীত, এমনকি স্ববিরোধী এক নির্দেশকে প্রভুর আদেশ হিসেবে মেনে নিতে? প্রভুর আদেশ বোধগম্য, অচেনা ও প্রশ্নসাপেক্ষ নয়; সেগুলো গেঁথে তোলার জন্য এবং আমাদের মঙ্গলের জন্য, কোনো এক লিঙ্গকে ছোট করার জন্য নয়।

আমি এই প্রশ্ন না করে পারি না: **হবার কন্যারা নীরব থাকুক এবং তাঁদের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হোক – এতে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ কার? এ হলো সেই পুরোনো সাপ, যে উদ্যানেই নারীকে আক্রমণ করেছিল। কিন্তু ঈশ্বর নারীর পক্ষে দাঁড়ান, নারীর বংশই সাপের মাথা চূর্ণ করবে।**

যাঁরা উপাসনায় বক্তব্য ও গান, প্রচার বা জীবনের সাক্ষ্যের মাধ্যমে বোনদের অংশগ্রহণের পক্ষে, তাঁদের বিরুদ্ধে কখনো কখনো ফেমিনিজম বা জাগতিকতার অভিযোগ আনা হয়। এর উত্তরে আমাকে বলতেই হয়: যদি এই দুটি পদ – যা খুবই সম্ভব – এমন এক জাগতিক আইনের প্রতিফলন হয়, যা নারীদের প্রকাশ্য জীবন থেকে বাদ দিতে চায় এবং এভাবে তাঁদের প্রতি বৈষম্য করে – তাহলে এই প্রশ্নে জাগতিক কে?

যদি নারীরা আজও সমাবেশে নীরব থাকেন প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীর এমন এক জাগতিক আদেশের কারণে, যা প্রতারণার মাধ্যমে বাইবেলে ঢুকে পড়েছে, তাহলে তা এক মর্মান্তিক কেলেঙ্কারি!

৯ বোনদের জন্য কি শিক্ষাদানে নিষেধাজ্ঞা আছে?

পৌল ও যীশু নারীদের সঙ্গে কেমন আচরণ করেছেন, তা দেখলে আমাদের মনেই আসত না যে নারীরা শিক্ষা দিতে পারবেন না। তাঁরা তাঁদের মধ্যে পড়েন, যাঁরা উপাসনায় কোনো শিক্ষা বলতে পারেন (১ করিন্থীয় ১৪:২৬), যাঁরা শিক্ষা দেন, যেমন প্রিষ্কা আপল্লোকে শিক্ষা দিয়েছিলেন (প্রেরিত ১৮:২৬), কিংবা যাঁদের উত্তম বিষয়ের শিক্ষাদাত্রী হওয়ার কথা (তীত ২:৩)। পুরুষদের মতো তাঁরাও সেই মানুষদের মধ্যে পড়েন, যাঁরা যা শিখেছেন, তা আবার অন্যদের শিক্ষা দিয়ে এগিয়ে দেন (২ তীমথিয় ২:২)। শিক্ষা দেওয়ার আত্মিক বরও কেবল পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় (রোমীয় ১২:৭)।

যীশু চান, পুরুষদের মতোই নারীরাও শিক্ষা দিন: (মথি ২৮:১৯-২০) অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর; **আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও।**

তবে কথা বলার নিষেধাজ্ঞার মতো এখানেও শাস্ত্রের **একটিমাত্র** বাক্য আছে, যা ঠিক এভাবে বোঝা হয় যে নারীরা শিক্ষা দেবেন না এবং নেতৃত্বও দেবেন না, অর্থাৎ কর্তৃত্ব খাটাবেন না। এই পদগুলো কেবল উপাসনার বিষয়ে, নাকি জীবনের সব ক্ষেত্র এর মধ্যে পড়ে – এ নিয়ে নানা মত আছে। উপাসনায় নীরবতার আদেশ থাকলে এ বিষয়ে বেশিরভাগ প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যেত: যাঁর কথা বলার অনুমতি নেই, তিনি সেখানে শিক্ষাও দিতে পারেন না।

১ তীমথিয় পত্রের এই অংশটি ইফিষের একটি ঐতিহাসিক ও সমস্যাপূর্ণ পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত, যা আমরা ঠিকমতো জানি না। আমাদের হাতে আছে কেবল এই পত্রটি, অর্থাৎ ঘটনার এক দিক। কোনো না-জানা বা নীরবতা থেকে সিদ্ধান্ত টেনে সেগুলোকে সব যুগের জন্য বাধ্যতামূলক আদেশ হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার আগে এ কথা আমাদের মাথায় রাখা উচিত। এই অর্থে পত্রটি আমাদের কাছে লেখা হয়নি, বরং আমাদের জন্য লেখা হয়েছে। অন্যদিকে প্রাপকেরা নিজেদের পরিস্থিতিতে সবকিছু বুঝেছিলেন। আসলে ৮-১৫ পদের পুরো অনুচ্ছেদটি বিবেচনা করা দরকার; আমরা ১১-১৪ পদেই সীমাবদ্ধ থাকছি। এই অধ্যায়ের শেষে পুরো অংশটির একটি ভাবানুবাদ থাকছে।

> [১ তীমথিয় ২:১১-১৪, জার্মান এলবারফেল্ডার বাইবেল থেকে অনূদিত] নারী শান্তভাবে, সম্পূর্ণ বশ্যতায় শিক্ষা গ্রহণ করুন। কিন্তু আমি একজন নারীকে শিক্ষা দেওয়ার, কিংবা পুরুষের উপরে কর্তৃত্ব করার অনুমতি দিই না, বরং তিনি শান্ত থাকুন; কারণ আদমকে প্রথমে গঠন করা হয়েছিল, তারপর হবাকে; আর আদম প্রতারিত হননি, কিন্তু নারী প্রতারিত হয়ে লঙ্ঘনে পড়লেন।

নারী শিক্ষা গ্রহণ করুন – এই বাক্যটিই অংশটির মধ্যে একমাত্র আদেশসূচক বাক্য, আর তা বৈপ্লবিক। বেশিরভাগ নারীর জন্য শিক্ষার সুযোগ ছিল না, তা কাম্যও মনে করা হতো না। এই নির্দেশগুলো বোঝার একটি চাবিকাঠি এখানেই। নারী – আর এখানে কেবল একজন নির্দিষ্ট নারী

("একজন" নারী) অথবা একদল নারীই বোঝানো হতে পারে – গ্রহণ করার মন নিয়ে শিখবেন। যাতে তাঁরা অর্ধেক জ্ঞান বা ভ্রান্ত শিক্ষা নিয়ে – যেগুলোর কথা ১ তীমথিয় পত্রে বারবার বলা হয়েছে – কর্তৃত্বপরায়ণ ভঙ্গিতে শিক্ষা না দেন, কিংবা নিজেদের স্বামীদের শেখাতে না যান।

এখানে কর্তৃত্ব করা শব্দটি আত্মিক নেতৃত্বও বোঝায় না, শিক্ষাদানের কর্তৃত্বও বোঝায় না। গ্রিক শব্দটি নতুন নিয়মে মাত্র একবারই এসেছে, আর তখনকার চলতি ভাষায় এর অর্থ ছিল নেতিবাচক। ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব বোঝাতে পৌল অন্য শব্দ ব্যবহার করেন। তাই তীমথিয়ের কাছে লেখা পত্রে শব্দটি এক বেসামাল আচরণ বর্ণনা করে – নেতিবাচক, হুমকিপূর্ণ, এমনকি সীমা লঙ্ঘনকারী আচরণ। পুরুষদেরও তিনি একই জিনিস নিষেধ করতেন। কিন্তু এখানে এটি ছিল নির্দিষ্টভাবে নারীদের একটি সমস্যা। **শিক্ষা দেওয়া ও কর্তৃত্ব করা** কোনো কাম্য সমন্বয় নয়, বরং একটি ভুল সমন্বয়; এর দ্বারা ঠিক কী বোঝানো হতে পারে, তা-ও আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না। কারণ যে সমস্যার কথা বলা হয়েছে, তা ঠিক কী ছিল, এই কথাগুলো থেকে আমরা কেবল তা পুনর্গঠনের চেষ্টা করতে পারি। **শিক্ষা দেওয়ার কর্তৃত্ব আসে সুস্থ শিক্ষা দেওয়া থেকে, শিক্ষাদানের বর থেকে, এবং মণ্ডলী ও মণ্ডলীর নেতৃত্বের সম্মতি ও সমর্থন থেকে।**

আরও সঠিকভাবে অনুবাদ করলে দাঁড়ায়: আমি একজন নারীকে এখন অনুমতি দিচ্ছি না ... এর মাধ্যমে এই অংশটি একটি স্থানীয় পরিস্থিতির কথা বলে, যা ভালোর দিকে বদলাতে পারত, যদি নারী নিজের পড়া তৈরি করে নিতেন। ঠিক এই সংশোধনগুলোর জন্য তাগিদ দেওয়াই গোটা পত্রের কারণ; পত্রটি কয়েকজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি ও ভ্রান্ত শিক্ষার কথা তোলে (১ তীমথিয় ১:৩-৬; ১:১৯-২০; ৪:১-১০; ৫:১৩-১৬; ৬:৩-১০; ৬:২০-২১)।

এরপর পৌল সংক্ষেপে আদম ও হবার কাহিনি তুলে ধরেন। তুলনা ও দৃষ্টান্ত হিসেবে। আদমের অগ্রাধিকার বর্ণনা করার জন্য নয়। কিংবা শিক্ষাদানে নিষেধাজ্ঞার কারণ হিসেবে হবার – আর তাই সব নারীর – বেশি দুর্বলতা বা প্রলোভনে পড়ার প্রবণতা দেখানোর জন্যও নয়। আদমকে প্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছিল – এই তথ্য আদমের নেতৃত্বের ভূমিকা, এবং তার ফলে পতনের আগের কোনো সৃষ্টির শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে না; পৌল কেবল প্রকৃত ক্রমটি উল্লেখ করেন। অন্যভাবে বললে: পৌল বলেন না যে নারীরা শিক্ষা দিতে পারবেন না, কারণ আদমকে প্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছিল। "কারণ" ছোট্ট শব্দটি মূল ভাষায় কখনো কখনো, তবে সব সময় নয়, কোনো যুক্তির সূচনা; বরং অন্য অনেক জায়গার মতো এটি কেবল পুরাতন নিয়ম থেকে নেওয়া একটি তুলনা ও চিত্রের সূচনা।

পৌল কেন এই প্রসঙ্গে আদম ও হবার কথা তোলেন, তা পুরোপুরি জানতেন কেবল প্রাপকেরা। আমরা নিচের ব্যাখ্যাগুলোকে সম্ভব ও বোধগম্য মনে করি, তবে সেগুলো থেকে সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত টানি না:

ইফিষে প্রচলিত নস্টিক শিক্ষাগুলোতে বাইবেলের সৃষ্টির কাহিনিকে পৌত্তলিক উপাদানের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা হয়েছিল, বিশেষ করে নস্টিসিজম বা জ্ঞানবাদের সঙ্গে (৬:২০)। এই শিক্ষাগুলো হবাকে তুলে ধরত প্রথম জন হিসেবে, এবং সেই নারী-শক্তি হিসেবে, যিনি আদমের মধ্যে প্রাণ ফুঁকে দিয়েছিলেন। হয়তো ক্রমের উপর জোর দিয়ে এই উল্লেখ ছিল একটি সংশোধন। ইফিষের

নগরজীবন যে আর্তেমিস দেবীর ধর্মাচার নিয়ন্ত্রণ করত, তার সঙ্গে যুক্ত পুরাণকাহিনি, শিক্ষা ও আচার নিয়ে তা সম্ভবত একটি ভূমিকা রেখেছিল। মণ্ডলীর জন্য এটি ছিল এক হুমকি। এখানে তা উল্লেখ করা হয়নি ঠিকই, কিন্তু প্রেরিত ১৯ অধ্যায়ে এর একটি জীবন্ত ছবি পাওয়া যায়। পৌল এই বিপদগুলো ভালোভাবেই জানতেন; তিনি অনেক দিন ইফিষে ছিলেন।

হবাকে কেবল আদমের পরে নয়, বরং আদম থেকে ও আদমের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল, যেন তিনি একজন সহায়ক, সমকক্ষ সঙ্গিনী হন, যিনি আদমের সঙ্গে সবকিছু ভাগ করে নেন। সাপ যখন হবার কাছে আসে, হবা প্রতারিত হন, কারণ মনে হয়, তিনি এই পরিস্থিতি একাই সামলাতে চেয়েছিলেন। জীবন-মরণের এই বিপদে তিনি নিজের সঙ্গীর দিকে ফেরেননি, যাতে দুজনে মিলে এই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারেন। তাই ইফিষের নারীরা, এবং শেষ পর্যন্ত সব নারী, সঙ্গীকে উপেক্ষা না করে তাঁদের সঙ্গে মিলে কাজ করবেন, আর প্রয়োজন হলে তাঁদের কাছ থেকে শিখবেন।

নিষিদ্ধ ফলের আদেশ আদম পেয়েছিলেন হবা আসার আগেই। এই অর্থে হবাকে তা নিজের স্বামীর কাছ থেকে শুনতে হয়েছিল। হবা হয়তো প্রতারিত হয়েছিলেন, কারণ তিনি যথেষ্ট মন দিয়ে শোনেননি। এটি ছিল ইফিষের কয়েকজন নারীর প্রতি একটি সতর্কবাণী: তাঁরা যেন শেখেন, এবং সুসমাচারের ও আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হন। **তখনই কেবল তাঁরা শিক্ষা দিতে পারবেন, পুরুষদেরও।** আদম প্রতারিত হননি; তিনি আদেশটি সরাসরি ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রথম হাতে জেনেছিলেন, এবং সম্পূর্ণ জেনেশুনে পাপ করেছিলেন। আদিপুস্তকে আমরা যেমন দেখেছি, আদমের পাপ প্রলোভনে পড়া ছিল না, বরং চোখ খোলা রেখে পাপ করা, অর্থাৎ পুরো জ্ঞান ও সম্মতি নিয়ে।

পৌলের পত্রের লক্ষ্য যেহেতু ভ্রান্ত শিক্ষার বিরুদ্ধে লড়াই করা (১:৩ থেকে), তাহলে কেন ২:১২ পদকে নারীদের দ্বারা সঠিক শিক্ষার নিষেধ হিসেবে পড়া হয়, আর নারীদের দ্বারা ভ্রান্ত শিক্ষার নিষেধ হিসেবে নয়?

অনুপযুক্ত ভঙ্গিতে ভুল শিক্ষা দেওয়া ইফিষে একজন বা কয়েকজন নারীর একটি নির্দিষ্ট সমস্যা ছিল। তবে এটা স্পষ্ট যে পুরুষদেরও ঠিক এমনটা করা উচিত নয়। যাঁরা সত্য শিখেছেন, তাঁরা সবাই সেবার মনোভাব নিয়ে অন্যদের শিক্ষা দেবেন।

এরপর ১ তীমথিয় ২:৮-১৫ পদের একটি ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ দেওয়া হলো। এই কঠিন অংশটি আমি সংক্ষেপে এভাবেই তুলে ধরতাম:

প্রিয় তীমথিয়, কয়েকজন পুরুষ ও কয়েকজন নারী এবং তাঁদের ভ্রান্ত শিক্ষা নিয়ে ইফিষে যে সমস্যা, তা সামলাতে হলে এই কাজগুলো করতে হবে: পুরুষেরা প্রার্থনা করতে শুরু করুন। যেখানেই তাঁদের দেখা হয়। প্রকাশ্যেও। পুরাণকাহিনি ও ভ্রান্ত শিক্ষা নিয়ে তর্ক করার বদলে। ক্রোধ ও বিবাদ প্রার্থনায় বাধা দেয়। একসঙ্গে প্রার্থনা এক শান্ত ও শান্তিপূর্ণ জীবন ও সহাবস্থানের দিকে নিয়ে যায়। তোলা, খোলা ও গ্রহণ করতে প্রস্তুত হাত নিয়ে – যে হাত বিবাদ ও হিংসা থেকে শুচি –

তাঁরা একসঙ্গে আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের আরাধনা করুন এবং ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে সব মানুষের জন্য মিনতি জানান।

অবশ্যই নারীরাও প্রার্থনা করবেন, ঠিক পুরুষদের মতো। এ ক্ষেত্রে জরুরি হলো, নারীরা – আমি বিশেষ করে ধনী নারীদের কথা বলছি – যেখানেই উপস্থিত হন ও তাঁদের দেখা যায়, সেখানে যেন বিনয়ী থাকেন। তাঁদের সাজসজ্জা, যা একে অপরকে ছাপিয়ে যাওয়ার জন্য পুরুষদের এবং নারীদেরও দৃষ্টি তাঁদের দিকে টানে, তা যেন ব্যয়বহুল ও চোখধাঁধানো কেশসজ্জায়, কিংবা সোনা ও মুক্তার গয়নায়, অথবা দামি ও অদ্ভুত পোশাকে না হয়। যে নারীরা মশীহকে অনুসরণ করেন, তাঁদের এভাবে নিজেদের জাহির করার, বা এই উপায়ে প্রভাব ও আধিপত্য খাটানোর কোনো প্রয়োজন নেই। এমন এক সাজ ও প্রভাব আছে, যার মূল্য আরও বেশি, যাকে সব মানুষই সম্মান করে: সৎকর্ম।

নারী শিখুন, সুসমাচারের সত্য কী। শেখার আগ্রহ নিয়ে, মনোযোগ দিয়ে, জানার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। নিজের ঘরে। বিশেষ করে এই নারীদের কয়েকজনকে আমি এখন এই সব ভ্রান্ত পুরাণকাহিনি ও শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়ার অনুমতি দিচ্ছি না। তাঁরা যেন নিজের স্বামীর উপরে নিজেদের তুলে না ধরেন, এবং স্বেচ্ছাচারী ভঙ্গিতে স্বামীর উপর আধিপত্য না খাটান ও তাঁকে শেখাতে না যান। তাঁদের স্বামীরা বা মণ্ডলীর পুরুষেরা যখন তাঁদের সুস্থ শিক্ষা ব্যাখ্যা করেন, তখন তাঁরা যেন শোনেন। কারণ তাঁদের এর প্রয়োজন আছে; তাঁদের জ্ঞানের অভাব রয়েছে, আর ঘরে ঘরে পুরাণকাহিনি ছড়ালে এই অজ্ঞতা বড় ক্ষতি করে।

আদম ও হবার সৃষ্টি এর জন্য একেবারে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত। আদমকে প্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছিল, আর হবাকে শিক্ষা দেওয়ার কথা ছিল আদমেরই। তিনি প্রতারিত হননি। কিন্তু হবা প্রতারিত হয়েছিলেন, বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। প্রলোভনের সময় তিনি নিজের সঙ্গীর দিকে ফেরেননি। নারীরা যদি আগ্রহ নিয়ে না শেখেন, তবে হবার মতোই প্রতারিত হবেন এবং অন্যদের জন্য ফাঁদ হয়ে উঠবেন। ইফিষের কোনো কোনো নারী যদি নিজেদের স্বামীর কাছ থেকে না শেখেন, তবে ঠিক তা-ই ঘটবে। কেবল যখন তাঁরা শিখেছেন, তখনই তাঁরা অন্যদেরও – পুরুষদেরও – শিক্ষা দিতে পারবেন।

আর এই নারীরা যেন জানেন যে সন্তান প্রসবের সময় তাঁদের রক্ষা করা হবে। হবার প্রলুব্ধ হওয়া এবং প্রসবের বড় ঝুঁকি সত্ত্বেও। কেবল ঈশ্বর, আমাদের ত্রাণকর্তা, উদ্ধার করেন; মানুষের তৈরি ইফিষের রক্ষাকারী দেবী আর্তেমিস নয়। তাই তাঁরা বিশ্বাস, প্রেম ও পবিত্রতার উপর মন দিন। দম্পতি হিসেবে একসঙ্গে, যাঁরা আদম ও হবার মতো একদেহ। নারীরা যেন সন্তান নিতে ভয় না পান। কেউ যেন তাঁদের বিয়ে করতে নিষেধ না করে। পুরুষেরা যৌন বিষয়ে আত্মসংযম রাখুন এবং মনে রাখুন যে অতিরিক্ত গর্ভধারণ তাঁদের স্ত্রীদের জন্য বিপদ।

১০ সকল বিশ্বাসীর যাজকত্ব

পরমদেশের উদ্যানে, পতনের আগে নির্দোষ অবস্থায়, আদম ও হবা রাজা, যাঁরা কর্তৃত্ব করেন, আর যাজক, যাঁরা ঈশ্বরের সান্নিধ্যে বাস করেন। তাঁর সঙ্গে ও তাঁর জন্য। চাষ করা ও রক্ষা করা – এই শব্দগুলো পরে যাজকের সেবাকাজের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে (আদিপুস্তক ২:১৫)।

এদনের পরমদেশ-উদ্যান মন্দিরের মহাপবিত্র স্থানের একটি প্রতিচ্ছবি। নতুন ও উন্নততর এদন, অর্থাৎ নতুন পৃথিবী, হবে এক বৈশ্বিক, বিশ্বজোড়া মহাপবিত্র স্থান। গোটা পৃথিবী হবে এক পরমদেশ-উদ্যান। তাই নতুন যিরূশালেম, নতুন সৃষ্টির এক প্রতিচ্ছবি, এক বিশাল ঘনকের আকারের (প্রকাশিত বাক্য ২১)। মন্দিরের মহাপবিত্র স্থানের আকারও ঠিক এই। নতুন পৃথিবীতে বাস করবেন নারী ও পুরুষ, রাজা ও রানি, যাজক ও নারী যাজক।

সেখানে কি পুরুষ ও নারীর সম্পর্কে কোনো স্তরবিন্যাস থাকবে? কেউ কেউ মনে করেন, না, কারণ সেটি নতুন সৃষ্টি। তাঁদের মতে স্তরবিন্যাস কেবল পুরোনো ও পতিত সৃষ্টির জন্যই প্রযোজ্য। কিন্তু মণ্ডলীতে নতুন সৃষ্টি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। সেখানে এই ভবিষ্যৎ এখনই পরস্পরের প্রতি আচরণে দৃশ্যমান হয়। তাহলে মণ্ডলীতে কেন এখনও এমন এক স্তরবিন্যাস থাকবে, যা ঈশ্বরের ইচ্ছা নয়? **যীশুর মণ্ডলীতে কেবল পরস্পরের ও স্বেচ্ছায় স্বীকার করা বশ্যতাই গণ্য হয়।**

ধর্মসংস্কার আন্দোলন সকল বিশ্বাসীর যাজকত্বের এই সত্যকে আবার আলোয় এনেছিল। কিন্তু মণ্ডলীর বাস্তব চর্চায় এর প্রতিফলন হয়নি, বা প্রায় হয়নি। কেউই, এমনকি ক্যাথলিক মণ্ডলীও, বিশ্বাসীদের সর্বজনীন যাজকত্ব নিয়ে সন্দেহ করে না। প্রশ্ন হলো, মণ্ডলীর জীবনে এই সত্যের ব্যবহারিক অর্থ কী। প্রত্যেক বিশ্বাসী – নারী ও পুরুষ – একজন যাজক, এটিই যথেষ্ট কারণ হওয়ার কথা যে উপাসনায় নারী ও পুরুষ দুজনেই একই ভূমিকা বা সেবাকাজ পেতে পারেন। মোটেই তা নয়। সকল বিশ্বাসীর যাজকত্ব একদিকে ব্যক্তিগতভাবে যাপন করা হয়। প্রার্থনা ও ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা এক ব্যক্তিগত, নিজস্ব আশীর্বাদ। যাজকত্বের ও তার সঙ্গে যুক্ত বলিদানের সেবার আদর্শ এসেছে পুরাতন নিয়ম থেকে, যেখানে যাজক উপাসনা পরিচালনা করতেন এবং বলি উৎসর্গ করতেন। **তাই সকল বিশ্বাসীর যাজকত্বের কথা ভাবলে বিশ্বাসীদের একত্র হওয়ার কথাও ভাবা স্বাভাবিক, যাঁরা আরাধনাকারী হিসেবে একসঙ্গে স্বর্গীয় পবিত্র স্থানে প্রবেশ করেন।** আর একসঙ্গে প্রভুর মেজে, অর্থাৎ আত্মিক বেদিতে, প্রশংসার আত্মিক বলি উৎসর্গ করেন। সেখানে কি নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকতে পারে, বা থাকা কি চলে? **ঈশ্বরের বাক্য নতুন চুক্তিতে এই পার্থক্যগুলো করে না। তাহলে আমাদেরও তা করা উচিত নয়।**

পুরাতন চুক্তিতে কেবল পুরুষেরাই যাজক ছিলেন। কিন্তু প্রত্যেক পুরুষ যাজক বা লেবীয় হতে পারতেন না। লেবীয় হতে হলে লেবীয় হিসেবে জন্ম নিতে হতো, আর যাজক হতে হলে হারোণের

পরিবার থেকে আসতে হতো। তার উপর ধর্মীয় বিধি অনুযায়ী শুচি থাকতে হতো, আর শরীরে কোনো খুঁত থাকা চলত না।

প্রসঙ্গত, যাজকের কাজ ছিল কসাইয়ের কাজের মতোই সহিংস ও পরিশ্রমসাধ্য। মধ্যপ্রাচ্যের গরমে পশু কেটে টুকরো করা ছিল ঘাম-ঝরানো কাজ, যা পুরুষেরাই ভালো করতে পারতেন, কারণ গড়ে তাঁরা নারীদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। উপাসনার এই ধরনের যাজকীয় কাজ আজ আর নেই।

আমাদের এটাও লক্ষ করা উচিত যে একটি বিশেষ (পুরুষ) লেবীয় যাজকত্বের উদ্ভব নিজেই ইস্রায়েলের ব্যর্থতার একটি চিহ্ন, কারণ তা গড়ে ওঠে তখনই, যখন সোনার বাছুরের মাধ্যমে লোকেরা প্রতিমাপূজায় প্রলুব্ধ হয়েছিল (যাত্রাপুস্তক ৩২), আর তার বিরুদ্ধে কেবল লেবীয়েরাই রুখে দাঁড়িয়েছিল (২৬-২৯ পদ)। **ঈশ্বরের প্রথম অভিপ্রায় ছিল, তাঁর লোকেরা সবাই হবে "যাজকদের এক রাজ্য" (যাত্রাপুস্তক ১৯:৬) – এক দর্শন, যা এখন খ্রীষ্টে ও খ্রীষ্টের মাধ্যমে বাস্তব হচ্ছে (প্রকাশিত বাক্য ১:৬; ইব্রীয় ১৩:১৫)। ঈশ্বরের লক্ষ্য পূর্ণ হয়েছে: নারী ও পুরুষ এখন ঈশ্বরের যাজক।**

আমাদের জীবন – কেবল পুরুষদের নয়, পুরুষ ও নারী সবার – ঈশ্বরের জন্য এক জীবন্ত বলি হোক – গোটা জীবনই এক যাজকীয় সেবা (রোমীয় ১২:১-২)।

১১ বোনেরা কি প্রাচীন হতে পারেন?

বোনদের জন্য যদি কোনো সাধারণ নীরবতার আদেশ এবং কোনো সাধারণ শিক্ষাদানে নিষেধাজ্ঞা না থাকে, তবে কি তাঁরা নারী প্রাচীন হতে পারেন?

কোনো কোনো মণ্ডলীতে আনুষ্ঠানিকভাবে নিযুক্ত প্রাচীনেরা আছেন, আর মণ্ডলীর প্রত্যেক সদস্য জানেন, কে প্রাচীন। আবার কিছু মণ্ডলী কেবল প্রাচীনদের একটি সেবাকাজের কথা বলে; তাঁদের কাজ কী – শিক্ষা দেওয়া, পাল রক্ষা ও পরিচালনা করা, যত্ন নেওয়া, তত্ত্বাবধান, পালকীয় পরিচর্যা – সেই প্রশ্নে এতে মূলত কোনো পার্থক্য হয় না।

প্রত্যেকেই নিজের সময়ের সন্তান, যদি না কেউ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করে। সময় বদলায়, কখনো কখনো ভালোর দিকে। আমি এ দিয়ে কী বলতে চাই? এই যে, নতুন নিয়মের পত্রগুলো এমন এক সময়ে লেখা হয়েছিল, যখন পিতৃতন্ত্রই ছিল সমাজের মূল বিন্যাস। নারীকে পুরুষের চেয়ে কম যোগ্য ও নিকৃষ্ট মনে করা হতো, আর তাই জনজীবনে নারীর উপস্থিতি ছিল না। নারীদের ভোটাধিকার ছিল না। ঠিক এই বৈষম্যই – ছোট আকারে হোক বা বড় আকারে – পতনের মধ্য দিয়ে এসেছে।

আমরা দেখেছি, **যীশু ও পৌল যুগের হাওয়ার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াননি, বরং নারীদের সেই মর্যাদা দিয়েছেন, যা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বহনকারী হিসেবে তাঁদের আছে।** তবুও, যতদূর আমরা জানি, প্রেরিতেরা ও তাঁদের সহকর্মীরা সম্ভবত কেবল পুরুষ প্রাচীনই নিযুক্ত করেছিলেন। এটা খুবই বোধগম্য। **তাঁদের শুরু করতে হয়েছিল যা ছিল, তা দিয়েই – মানুষ নিজেদের সংস্কৃতিতে যেখানে বাস করত, সেখান থেকে; যেখানে তাদের দেখতে চাওয়া হতো, সেখান থেকে নয়।** কিন্তু এর মানে এই নয় যে সব সময় এমনই থাকতে হবে বা থাকা উচিত। করিন্থের ফৈবী (রোমীয় ১৬:১) কেবল একটি ব্যতিক্রম, যা পৌলের সময়েই সম্ভব ছিল। নেতৃত্ব নিজে থেকে পুরুষদের বিষয় নয়। এমনকি বড় আকারের গবেষণাও আছে, যা দেখায় যে নারীরাই ভালো নেতা। আমি তা বিচার করতে পারি না, তবে এতে মূলত এটুকু স্পষ্ট হয় যে নারীদের কোনো মানসিক বা বুদ্ধিগত সীমাবদ্ধতা নেই।

কিন্তু নতুন নিয়ম কী বলে? এই প্রশ্নে ১ তীমথিয় ৩:১ পদে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত আছে, যা প্রায় চোখেই পড়ে না:

> এই কথা বিশ্বসনীয়, যদি কেহ অধ্যক্ষপদের আকাঙ্ক্ষী হন, তবে তিনি উত্তম কার্য্য বাঞ্ছা করেন।

এই পদটি ঠিক সেই অংশের পরেই আসে, যেখানে একজন নারীর ভ্রান্ত শিক্ষা ও কর্তৃত্ব খাটানোর কথা ছিল। **এই পদ কোনো নতুন অংশ শুরু করে না, বরং ২:৮-১৫ পদের সমাপ্তি।** মূল লেখাগুলোতে অনুচ্ছেদ, পদসংখ্যা ও শিরোনাম ছিল না। ৩ অধ্যায়ের ১ পদ ২:১১-১৫ পদের সেই

নারী বা নারীদের সঙ্গে সম্পর্কিত। এখানে বলা হয়নি, যদি কোনো পুরুষ এমন সেবাকাজের আকাঙ্ক্ষা করেন। এর অর্থ সমানভাবে হতে পারে, যদি কোনো নারী বা নারীরা এমন সেবাকাজের আকাঙ্ক্ষা করেন। **"কেহ" শব্দটি নিরপেক্ষ – না পুরুষবাচক, না স্ত্রীবাচক।**

পৌল চেয়েছিলেন, নারীরা অন্যদের শিক্ষা দেওয়ার আগে নিজেরা শিখুন। আর শেখার পরেও যেন কর্তৃত্বপরায়ণ ভঙ্গিতে শিক্ষাদানের অধিকার নিজেদের হাতে তুলে না নেন। তখন তাঁরা এই অধ্যক্ষ বা প্রাচীনের সেবাকাজে প্রবেশ করতে পারতেন, কিংবা এর জন্য আহূত হতে পারতেন। প্রয়োজনীয় পরিপক্কতা ও যোগ্যতা থাকলে এই সেবাকাজ তাঁদের জন্য খোলা ছিল (কেবল তখনই নয়, যখন কোনো পুরুষ ছিলেন না)। পৌল এখানে নারীদের জন্য দরজা খুলে দেন; আর এমন নারীদের তিনি অনেক আগে থেকেই নিজের সহকর্মী হিসেবে চিনতেন।

এরপর আসে প্রয়োজনীয় যোগ্যতাগুলো। সেগুলো থেকে বোঝা যায়, স্বাভাবিকভাবেই পুরুষেরাও এই সেবাকাজ করবেন। পুরুষদের কেবল একজন স্ত্রী থাকবে। যে নারীরা নারী প্রাচীন হতে চাইতেন, তাঁদের জন্যও একই কথা প্রযোজ্য ছিল। **সর্বনামগুলো তালিকার শুরু থেকেই নিরপেক্ষ। "এক স্ত্রীর স্বামী" তখন ছিল বৈবাহিক বিশ্বস্ততার, একগামিতারও, একটি বাগধারা – কেবল পুরুষেরাই প্রাচীন হতে পারবেন, এমন দাবির নয়।**

সেই সময়ে পুরুষেরা pater familias হিসেবে ঘরের প্রধান ছিলেন। এতে ভালো হওয়া ছিল একটি যোগ্যতা, যা এভাবে নারীদের ক্ষেত্রেও খাটতে পারত (১ তীমথিয় ৫:১৪ – সংসার পরিচালনা করা)। পৌল তাঁর পত্রগুলোতে এই সব গুণ নারীদের কাছেও দাবি করেন। এই যোগ্যতাগুলো, কিংবা অধ্যক্ষের পদ নিজেও, কেবল পুরুষদের বিষয় নয়।

নারীরাও এই উত্তম কাজের আকাঙ্ক্ষা করতে পারেন!

ডিকনের সেবাকাজ নিয়ে বিতর্ক কম: ১১ পদ দেখায় যে নারীরাও ডিকন হবেন।

মণ্ডলীর নেতৃত্ব থেকে নারীদের বাদ দেওয়ার মানে নিজেরই ক্ষতি করা (ইফিষীয় ৫:২৯)। দুঃখের বিষয়, নেতৃত্বের পরিসর ও "ভাইদের সভা" থেকে বোনদের বাদ দেওয়ার ফলে প্রায়ই অল্প যোগ্য বা অযোগ্য পুরুষেরা মণ্ডলীর নেতৃত্বে এসেছেন। এর ফলে যে ক্ষতি হয়েছে, তা এখানে বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই।

পবিত্র আত্মা পুরুষ ও নারীকে নেতৃত্ব ও পরিচালনার বর দান করেন (১ করিন্থীয় ১২:২৮; রোমীয় ১২:৮)। আসুন, আমরা এমন নারীদের খুঁজতে শুরু করি, তাঁদের এগিয়ে নিয়ে যাই এবং এ ধরনের সেবাকাজে তাঁদের আমন্ত্রণ জানাই। প্রথম সহজ পদক্ষেপ হতে পারে, পুরুষ নেতাদের স্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে নেতৃত্বের সভা করা।

পিতর ও পৌল যদি মনে করেন যে মণ্ডলীর নেতৃত্ব কেবল পুরুষদের জন্য সংরক্ষিত, তাহলে নেতৃত্বের বর সম্পর্কে তাঁদের শিক্ষা কেন পুরুষ ও নারী উভয়কেই উদ্দেশ করে, অথচ এই

সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট করে না? আত্মিক বর সম্পর্কে শিক্ষা দেখায় যে নতুন চুক্তিতে মণ্ডলীর নেতৃত্বের বিষয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

যীশু তাঁর নতুন আন্দোলনের ভিত্তি-প্রেরিত হিসেবে বারোজন প্রেরিতকে বেছে নিয়েছিলেন – এটাও এর বিরোধী নয়। হ্যাঁ, তাঁরা সবাই ছিলেন ইহুদি, স্বাধীন ও পুরুষ। **কিন্তু তিনি তাঁদের নিযুক্ত করেছিলেন এক পরিবর্তনের সময়ে, নতুন চুক্তির সূচনার আগে। বারোজন কুলপতির আদলে তাঁরা যীশুর অনুসারী হিসেবে ঈশ্বরের লোকদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতীক ছিলেন।**

এটা অবিসংবাদিত যে পঞ্চাশত্তমীর পরে, আত্মার যুগে, পরবর্তী মণ্ডলী-নেতারা অইহুদি বা দাস হতে পারতেন। বারোজন ইহুদি ও স্বাধীন ছিলেন – এটা এমন নেতাদের বিরুদ্ধে কোনো যুক্তি নয়। ঠিক তেমনি বারোজন প্রেরিতের পুরুষ হওয়াও এর বিরুদ্ধে কোনো যুক্তি নয় যে পরবর্তী নেতারা নারী হতে পারেন।

নেতৃত্বের সেবাকাজে নারীদের কোনো স্থান নেই – এটা যদি প্রেরিতদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হতো, তবে তাঁরা তা বলতেন। কিন্তু কোথাও নারীদের বাদ দেওয়ার ইঙ্গিতমাত্রও নেই।

শেষে সেই আপত্তির কথা: এই সব নাকি সবকিছু সমান করে দেওয়া, এবং পুরুষ ও নারীর সৃষ্টিগত পার্থক্যের বিলোপ। আমি এর স্পষ্ট বিরোধিতা করি, কারণ আদমের পাশে দ্বিতীয় এক আদমকে দাঁড় করানো হয়নি, বরং একজন হবাকে। আদমের যা নেই, হবার তা আছে। একসঙ্গে তাঁরা একে অপরের পরিপূরক, কোনো স্তরভিত্তিক বা পদমর্যাদাগত উঁচু-নিচু ভেদ ছাড়াই।

পুরুষ ও নারীর পার্থক্য সুস্পষ্ট, তা উপেক্ষা করার উপায় নেই। সমতাভিত্তিক (ইগালিটেরিয়ান) শব্দটি, অর্থাৎ পুরুষ ও নারীর সমতা, এই আলোচনায় খুব একটা কাজে আসে না। এখানে প্রশ্নটা এই নয় যে পুরুষ হওয়াকে নারী হওয়া থেকে – এবং উল্টোটাও – কী আলাদা করে; বরং প্রশ্ন হলো এমন এক অবাইবেলীয় পদমর্যাদার পার্থক্যকে বাদ দেওয়া, যার মাধ্যমে মণ্ডলীতে নারীর কাজকে সীমিত বা এমনকি বন্ধ করে দেওয়া হয়। **নারীদের কাজকে সংকুচিত করার অর্থ শেষ পর্যন্ত পবিত্র আত্মাকে প্রতিরোধ করা।**

১২ মাথা ঢাকা – আজও?

তথাকথিত মাথার আবরণ নতুন নিয়মে কেবল ১ করিন্থীয় ১১:২-১৬ পদে আছে। বোঝাই যায়, করিন্থে এটি ছিল এক বিতর্কিত বিষয়। এখানেও আমরা পত্রপ্রাপকদের প্রেক্ষাপট জানি না। পৌল এ বিষয়ে যে প্রতিটি বাক্য লিখেছেন, করিন্থীয়রা নিশ্চয়ই তা বুঝেছিলেন। আমার ব্যাখ্যার চেষ্টা অনেকগুলোর মধ্যে একটি। আমাদের জন্য এটি একটি কঠিন অংশই থেকে যায়। বিষয়টি বুঝতে, প্রিয় বোন, আপনাকে অনুরোধ করি: আপনি যদি মাথা ঢাকেন, তবে একবার নিজের কাছে এই অংশ থেকে তার কারণ স্পষ্ট করে নিন। **আপনি কেন, কোথায় ও কখন মাথা ঢাকেন (যদি তা আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়)?**

এখানে বিষয় হলো পৌলের এই লেখা – যা আমাদের কাছে নয়, বরং আমাদের জন্য লেখা – প্রয়োগ করা এবং এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া: এটি কি আজও বাধ্যতামূলক, আর যদি হয়, তবে কীভাবে?

এই অংশটি প্রায়ই এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়: পুরুষ, অর্থাৎ স্বামী, নারীর মস্তক, আর সৃষ্টিগতভাবে নেতৃত্বের ভূমিকা তাঁর। নারী, অর্থাৎ স্ত্রী, প্রকাশ্যে প্রার্থনা ও ভাববাণী বলার সময় তা প্রকাশ করেন মাথায় কিছু রেখে – একটি মাথার আবরণ (আজ: মাথার কাপড়, টুপি, ঘোমটা ইত্যাদি)। ঢাকার জন্য কোন পোশাক বোঝানো হয়েছে, তা অস্পষ্ট থাকে। সম্ভবত দরকার হলে উপরের পোশাকের লম্বা প্রান্তটি মাথার চারপাশে ও উপরে জড়িয়ে নেওয়া হতো।

প্রথম প্রশ্ন হলো, কোথায় মাথা ঢাকার দাবি করা হয়েছে: উপাসনায়, নাকি উপাসনার বাইরে? বিষয়টি হলো, বোনেরা **কোথায়** প্রার্থনা করেন ও ভাববাণী বলেন। আগের একটি অধ্যায়ে (৮ম অধ্যায়ে) আমি বলেছি, এটি অবশ্যই উপাসনার সঙ্গে সম্পর্কিত, অর্থাৎ সেই স্থান, যেখানে পুরুষ ও নারী একসঙ্গে প্রার্থনা করেন ও ভাববাণী বলেন।

সাধারণত ধরে নেওয়া হয় যে পৌল নারীদের মাথা ঢাকতে বলেন, কারণ তাঁরা বা তাঁদের কেউ কেউ আর তা চাইতেন না। তা হতে পারে। ১০ পদের ভিত্তিতে আমি বরং উল্টোটা দেখি: **কিছু পুরুষ দাবি করতেন যে নারীরা তাঁদের মাথার আবরণ খুলে ফেলুন।** হয় নতুন খ্রীষ্টীয় স্বাধীনতা হিসেবে, নয়তো অনৈতিক উদ্দেশ্যে – অর্থাৎ মণ্ডলীর নারীদের ও তাঁদের চুল এমনভাবে দেখার জন্য, যা অন্যথায় সম্ভব ছিল না বা প্রায় সম্ভব ছিল না। **তাই পৌল নারীদের উৎসাহ দেন এবং সব নারীকে মাথা ঢাকার অধিকার দেন (১০ পদ)।** তবে কে কী দাবি করছিল, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অপরিহার্য নয়।

এর জন্য জানা দরকার, সেই সময়ে গ্রিক করিন্থে ও রোমান সাম্রাজ্যে মাথার আবরণের কী ভূমিকা ছিল। বিবাহিত নারীরা প্রকাশ্যে সব সময় মাথার আবরণ পরতেন, কেবল উপাসনায় নয়। এটি ছিল বিবাহিত নারী হিসেবে তাঁদের মর্যাদার অংশ – যিনি অন্য পুরুষদের জন্য লভ্য নন। যৌনকর্মী ও

দাস নারীদের বিপরীতে, যাঁরা মাথা ঢাকতেন না। শেষোক্তদের জন্য তা নিষিদ্ধ ছিল। মাথা ঢাকা – সম্ভবত ঘোমটার মতো একটি আবরণ – একদিকে ছিল সুরক্ষা, অন্যদিকে স্বামীর প্রতি আনুগত্যের চিহ্ন। এই আবরণের মাধ্যমে একটি সামাজিক মর্যাদা প্রকাশ পেত। **মাথার আবরণের ক্ষেত্রে বশ্যতার প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক ছিল না। সেই প্রাচীন সংস্কৃতিতে নারীরা এমনিতেই বশ্যতায় ছিলেন। মাথার আবরণ বশ্যতার চিহ্ন ছিল না, বরং সম্পর্কের চিহ্ন – অর্থাৎ নারীকে তাঁর স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কিত করার। বশ্যতা এই করিন্থীয় অংশের বিষয়ই নয়।** করিন্থে এবং তখন প্রায় সব জায়গায় যা ছিল ভালো সামাজিক রীতি, তা আজও ইসলামি দেশগুলোতে আছে, কিন্তু আমাদের এখানে পশ্চিমে আর নেই। মাথার আবরণের মতো প্রতীক কেবল সেখানেই অর্থবহ, যেখানে সমাজ ও তার সংস্কৃতি জানে সেগুলোর অর্থ কী।

পৌল ১০ পদে মাথা ঢাকার বিষয়টি মীমাংসা করতে একটি স্পষ্ট ঘোষণা দেন – **লক্ষ করুন, মূল ভাষার লেখায় মস্তকের উপরে কর্তৃত্বের বা ক্ষমতার কোনো চিহ্ন রাখার কথা নেই** (অর্থাৎ একটি মাথার আবরণ)। সঠিকভাবে অনুবাদ করলে দাঁড়ায়:

> **এই কারণে, স্বর্গদূতদের জন্য, নারীর নিজের মস্তকের উপরে কর্তৃত্ব থাকা উচিত।**

এই পদ দেখায় যে হয়তো এই দাবি তোলা হয়েছিল যে মাথার আবরণের আর দরকার নেই, কারণ পৌল এবার বলেন: নারী নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, তিনি মাথার আবরণ পরবেন কি না। আর তা মণ্ডলীর সব নারী। সেই অবিবাহিত নারী, মুক্তিপ্রাপ্ত নারী, দাস নারী ও যৌনকর্মীরাও, যাঁরা বিশ্বাসে এসেছেন। পৌল প্রত্যেক নারীকে মণ্ডলীতে, অর্থাৎ উপাসনায়, মাথা ঢাকার মর্যাদা দেন। যাঁকে একদিন স্বর্গদূতদের বিচার করার যোগ্য গণ্য করা হয়েছে (১ করিন্থীয় ৬:৩), তিনি নিশ্চয়ই এই বিষয়ে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

এর মাধ্যমে পৌল সেই প্রশ্নেরও উত্তর দেন, যা আমরা একবিংশ শতাব্দীতে এই অংশটি পড়ার সময় করি: প্রত্যেক নারী নিজেই ঠিক করেন, মাথা ঢাকা তাঁর জন্য উপযুক্ত কি না। তাঁর স্বামী নন, মণ্ডলীর নেতৃত্বের পুরুষেরাও নন। আজ উপাসনায় মাথার আবরণ বাইরের লোকদের মনে বরং বিভ্রান্তি জাগায়। করিন্থে এটি যা করত, এ ঠিক তার উল্টো। আজকের দিনে মাথার আবরণ আক্ষরিক অর্থেই সেকেলে।

সাংস্কৃতিক ও সময়ের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া বিষয়গুলোর বিপরীতে এই অংশ থেকে যা সব যুগের জন্য প্রযোজ্য থাকে, তা হলো:

- **মস্তকের অর্থ প্রধান, নেতা বা কারও উপরে কর্তৃত্ব নয়, বরং উৎপত্তি ও উৎস।**
- খ্রীষ্ট মস্তক হিসেবে পুরুষের সম্মানযোগ্য উৎপত্তি (পুরুষের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে); পুরুষ (আদম) মস্তক হিসেবে নারীর (হবার) সম্মানযোগ্য উৎপত্তি; আর ঈশ্বর মস্তক হিসেবে খ্রীষ্টের সম্মানযোগ্য উৎপত্তি (তাঁর দেহধারণে)।
- **পুরুষ ও নারী উপাসনায় প্রার্থনা করেন ও ভাববাণী বলেন।**

- প্রত্যেকে নিজের সম্মানযোগ্য মস্তককে নিজের অস্তিত্বের উৎস ও উৎপত্তি হিসেবে সম্মান করে, বিশেষ করে সম্মান ও লজ্জার সংস্কৃতিতে। লজ্জা ও অসম্মান ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, বরং সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত।
- **পুরুষ ও নারীর পার্থক্য চেনার মতো থেকে যাওয়া উচিত।**
- পুরুষ ও নারী একে অপরের উপর নির্ভরশীল, তাঁরা কোনো স্তরবিন্যাস বা মূল্য ও পদমর্যাদার পার্থক্য ছাড়াই একে অপরকে পূর্ণ করেন।
- **ঈশ্বরের মহিমা ও সম্মান থাকে সবার আগে। উপাসনায় কোনো কিছুই যেন ঈশ্বরের দিক থেকে মনোযোগ সরিয়ে না নেয়।**
- পৌল এই লিঙ্গ-বিষয়টিকে একটি বাক্যে গুছিয়ে বলেন, যা সমমর্যাদাকে একেবারে মূল কথায় তুলে ধরে, যেমনটা সমবেত মণ্ডলীতে, উপাসনাতেও প্রযোজ্য:
- কারণ যেমন পুরুষ হইতে স্ত্রী, তেমনি আবার স্ত্রী দিয়া পুরুষ হইয়াছে, কিন্তু সকলই ঈশ্বর হইতে। [১ করিন্থীয় ১১:১২]

এই জটিল অংশে অবশ্যই কেবল এই একটি ১০ পদের (বা ১২ পদের) চেয়ে অনেক বেশি কিছু আছে; পদটি অংশটির ঠিক মাঝখানে রয়েছে।

তাই, ১ তীমথিয় ২-এর মতো এখানেও আমার ব্যাখ্যামূলক পুরো অংশটির অনুবাদ দেওয়া হলো, যেভাবে আমি সংক্ষেপে এটি ব্যাখ্যা করতাম:

আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ, তোমরা করিন্থীয়রা যেন সচেতন হও যে প্রত্যেক পুরুষের উৎপত্তি, অর্থাৎ মস্তক, হলেন খ্রীষ্ট, সেই মশীহ। তাঁর মাধ্যমেই আদম, আর তাঁর সঙ্গে সব পুরুষ সৃষ্ট হয়েছে। আর পুরুষ হিসেবে তোমরা তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত।

নারীর মস্তক পুরুষ। পুরুষের পাশ থেকে হবাকে গঠন করা হয়েছিল, যেন তিনি পুরুষের সঙ্গে এক হন। পুরুষ মস্তক, নারী দেহ। পুরুষ নারীর উৎপত্তি, আর নারীও পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কিত – স্ত্রী হিসেবে, সহায় ও পরিপূরক হয়ে।

এই সম্পর্ক আমরা খ্রীষ্টের ক্ষেত্রেও দেখি। তাঁর মস্তক ঈশ্বর। খ্রীষ্ট যখন মানুষ হলেন, তখন ঈশ্বর তাঁকে, তাঁর পুত্রকে, জন্ম দিলেন – যে পুত্র তাঁর সমান।

করিন্থে কোনো পুরুষ যদি সমাবেশে জোরে, সবাই শুনতে পায় এমনভাবে প্রার্থনা করেন বা ভাববাণী বলেন, আর তাঁর মাথা ঢাকা থাকে, তবে তা অসম্মানজনক। তিনি নিজেকেই সম্মান দেন, নিজের মস্তক খ্রীষ্টকে নয়। কারণ প্রতিমাপূজকেরা প্রতিমার কাছে বলি দেওয়ার সময় মাথা ঢাকে। মাথা না ঢেকে পুরুষ নম্রতা দেখান এবং অদৃশ্য খ্রীষ্টকে সম্মান দেন।

নারীদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা উল্টো। যে নারীরা সমাবেশে প্রার্থনা করেন ও ভাববাণী বলেন অথচ মাথা ঢাকেন না, তাঁরা নিজেদের মস্তকের উপর লজ্জা ডেকে আনেন। তাঁরা নিজেদের এবং

নিজেদের স্বামীকে, অর্থাৎ নিজেদের মস্তককে, অসম্মান করেন। কারণ খোলা চুলে তাঁরা ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের দিকে নয়, নিজেদের দিকে মনোযোগ টানেন।

কেউ যদি দাবি করে যে নারীদের মাথা ঢাকার দরকার নেই, তবে সে বিষয়টি শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখেনি। কারণ তোমরা তো জানো, করিন্থে মাথা না-ঢাকা নারীকে মাথা-কামানো নারীর মতো গণ্য করা হয়, এমন নারীর মতো, যে দেহ বিক্রি করে বা যৌন সম্পর্কের সুযোগ খোঁজে। প্রকাশ্যে সে যদি নিজেকে আবৃত না করে বা মাথা না ঢাকে, তবে যুক্তি অনুযায়ী তার চুলও কেটে ফেলা উচিত, কিংবা পুরো মাথা কামিয়ে ফেলা উচিত।

আমি জানি, তোমাদের দাবির উদ্দেশ্য এটা নয়! কিন্তু তোমরা যে সমাজে বাস করছ, সেখানে এটাই হতো এর পরিণতি! তাই যাঁরা তোমাদের কাছে আসেন এবং দেখেন যে প্রকাশ্যে মাথা ঢাকার প্রচলিত রীতি তোমাদের মধ্যে প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে, তাঁদের জন্য বাধার কারণ হওয়ার ঝুঁকি নিয়ো না।

উপাসনায়, ঈশ্বরের সান্নিধ্যে, পুরুষেরা যেন মাথা না ঢাকেন। কারণ পুরুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি এবং তাঁর মহিমার প্রতিফলন। নারীও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, কিন্তু উপরন্তু তিনি পুরুষের মহিমার প্রতিফলনও। নারীর সৌন্দর্য তাঁর স্বামীর সৌন্দর্য, যাঁর থেকে তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যাঁর সঙ্গে তিনি এক।

নারী কীভাবে পুরুষের মহিমা হয়ে উঠলেন? নিশ্চয়ই এই কারণে নয় যে পুরুষকে নারী থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল; বরং এই কারণে যে নারীকে পুরুষ থেকে, পুরুষের পাশ থেকে গঠন করা হয়েছিল। আর নারী পুরুষের মহিমা এই কারণে নন যে পুরুষকে নারীর জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল, বরং উল্টোটা। নারীকে পুরুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল, কারণ পুরুষ একা ছিলেন এবং তাঁর সহায়ের প্রয়োজন ছিল।

সেই কারণে – নারীর এমন মূল্য, আর তিনি পুরুষের জন্য এত বড় আশীর্বাদ বলে – নিজের মাথার বিষয়ে তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত নেবেন এবং তা ঢাকবেন কি না, ঠিক করবেন। কেউ তাঁকে তা বলে দিতে পারে না। তাঁর স্বামী বা মণ্ডলীর নেতারা – কেউই তাঁকে মাথার আবরণ না পরার (বা পরার) নির্দেশ দিতে পারেন না। একদিন তিনি এমনকি স্বর্গদূতদেরও বিচার করবেন – তাহলে এই বিষয়ে নিশ্চয়ই তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন, আর তাঁর সে অধিকারও আছে।

তবে নিজের স্বাধীনতা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারের মধ্যেও নারী যেন মনে রাখেন, তিনি নিজের স্বামী থেকে স্বাধীন নন। পুরুষ ছাড়া নারীর অস্তিত্ব নেই, আর নারী ছাড়াও পুরুষের অস্তিত্ব নেই। ঈশ্বরের পরিকল্পনা সব সময়ই ছিল পুরুষ ও নারীর একসঙ্গে থাকা ও মিলেমিশে চলা। মস্তক ও দেহের ঐক্যে তাঁরা একসঙ্গে কাজ করেন – একমত হয়ে, পরস্পরের বশ্যতা স্বীকার করে, একে অপরকে পূর্ণ করে।

একজন অন্যজন ছাড়া অস্তিত্বহীন – এর মানে কী? প্রথম মানব-দম্পতির সৃষ্টির কথা আরেকবার মনে করো। শুরুতে নারী এসেছিলেন পুরুষ থেকে। পুরুষের পাশ থেকে। তাঁকে পুরুষের কাছে আনা হয়েছিল, যেন তিনি আবার পুরুষের সঙ্গে একদেহ হন। কিন্তু আরও ভাবো: তখন থেকে

প্রত্যেক পুরুষ আসে একজন নারী থেকে। পুরুষ না থাকলে নারী থাকত না, আর নারী না থাকলে পুরুষ থাকত না। দুজনেই সমমর্যাদার, সমমূল্যের, সমান অবস্থানের – তাঁদের ভিন্নতার মধ্যে নিখুঁত পরিপূরক। এই সবই ছিল ঈশ্বরের পরিকল্পনা। তিনিই সেই মস্তক, যাঁর থেকে এই সব এসেছে।

এই সব বিবেচনা করে আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা করি: কোনো নারী যদি প্রকাশ্যে, অথচ অনাবৃত ও মাথা না ঢেকে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন, তা কি শোভন? না – তোমরা একমত হবে – করিন্থ ও রোমান সাম্রাজ্যের রীতিনীতি বিবেচনা করলে তা শোভন নয়। এমন কিছু প্রথা ও রীতি আছে, যা মানুষের কাছে প্রাকৃতিক নিয়মের মতো। কোনো পুরুষ যদি প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে লম্বা চুল রাখেন, তবে তা লজ্জার বিষয় বলে গণ্য হয়। এখানেও নারীদের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টো। নারীদের লম্বা চুল তাঁদের মহিমা, তাঁদের স্বাভাবিক অলংকার, আর তা সেভাবেই দেখা হয়। লম্বা চুল নারীকে দেওয়া হয়েছে এক শোভন ঘোমটা বা আবরণের মতো, যেন তিনি পুরুষের মহিমা হন।

পুরুষদের কাছে এত আকাঙ্ক্ষণীয় মনে হয় যে অলংকার, সমাবেশে নারী তা ঢেকে রাখবেন। এই মহিমা নিয়ে নজর কাড়ার জায়গা এটা নয়, ঠিক যেমন পুরুষ খোলা মাথায় নিজের নম্রতা দেখাবেন। কারণ বিষয়টি ঈশ্বরের ও খ্রীষ্টের সম্মান ও মহিমা।

করিন্থে কেউ যদি এ নিয়ে তর্ক করতে চায় এবং মাথা ঢাকার এই রীতি নিয়ে প্রশ্ন তোলে, তবে তার নিজের কাছে স্পষ্ট হওয়া উচিত যে এমনটা কোথাও নেই। যেমন তোমরা নারীদের মাথার আবরণ না পরতে নির্দেশ দিতে চাইছ। কোনো মণ্ডলী এমন কিছু চর্চা করে না; তাই মাথার আবরণ বিষয়ে যা সাধারণত প্রচলিত ও শোভন, এবং যা কারও কাছে বাধার কারণ হয় না, তা-ই মেনে চলো।

১৩ পুরুষ মস্তক – একতরফা বশ্যতা?

পৌল ও পিতর অন্তত সাতবার স্ত্রীদের উদ্দেশে বলেন, তাঁরা যেন নিজেদের স্বামীর বশ্যতা স্বীকার করেন – এমনকি স্বামীরা বিশ্বাসী না হলেও, এবং প্রেমপূর্ণ আচরণ না করলেও। সেই সময়ে নারীদের এমন আচরণ করতেই হতো – এটা ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, নতুন কিছু নয়। স্বামী ছিলেন ঘরের কর্তা। তিনি শাসন করতেন, আর সবাই তাঁর অধীন ছিল: স্ত্রী (বা স্ত্রীরা), সন্তানেরা, দাসেরা ও ঘরের অন্য বাসিন্দারা। মহান দার্শনিক অ্যারিস্টটল প্রাচীন যুগে ঘরকে এভাবেই সাজিয়েছিলেন – উপর থেকে নিচে, স্পষ্ট স্তরবিন্যাসসহ। এভাবেই জীবন চলত, এভাবেই তা সাম্রাজ্য ও প্রাচীন সমাজকে স্থিতি ও শৃঙ্খলা দিত। এর ব্যতিক্রম সহ্য করা হতো না। এটা বাইবেলের আদর্শ ছিল না, কারণ এই ব্যবস্থা পুরুষ ও নারীকে স্তরবিন্যাসহীন সমকক্ষ সঙ্গী হিসেবে বর্ণনা করে না। কিন্তু পতনের পরে যেমন আগেই বলা হয়েছিল, অবস্থা তেমনই হয়ে দাঁড়িয়েছিল (আদিপুস্তক ৩:১৬)। গোটা রোমান সাম্রাজ্যে সুসমাচার ঠিক এই সামাজিক কাঠামোরই মুখোমুখি হয়।

বশ্যতার উপর কেন এত জোর দেওয়া হয়, আর আজও কি তা একইভাবে প্রযোজ্য? অনেক নারী নিজেদের ভূমিকাকে দুঃসহ ও উপায়হীন বলে অনুভব করতেন। যতটা সম্ভব, তাঁরা মানিয়ে নিতেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাঁরা স্বামীর চেয়ে অনেক ছোট ছিলেন, ছিলেন স্বামীর সম্পত্তি; তাঁদের কোনো কণ্ঠস্বর ছিল না, স্বাধীনতা প্রায় ছিল না, কোনো অধিকারও ছিল না। ভালোবেসে বিয়ে বলে কিছু ছিল না! বশ্যতা আনন্দের চেয়ে বেশি ছিল বোঝা ও জোরজবরদস্তি। এখন যীশুকে স্বীকারকারী হিসেবে তাঁরা যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে এক জীবন্ত সম্পর্কে এসেছেন। এখন তাঁরা তাঁর সঙ্গে জীবন যাপন করেন, আর এখন শিখতে পারেন, প্রভুর প্রতি যেমন, তেমনি অন্তর থেকে নিজেদের স্বামীর বশ্যতা স্বীকার করতে। সুসমাচার তাঁদের যে স্বাধীনতা এনে দিয়েছিল, আর নারী হিসেবে যে মর্যাদা ফিরিয়ে দিয়েছিল, তা স্বামীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উপলক্ষ হয়ে ওঠার প্রয়োজন ছিল না। প্রেরিতেরা খুব গুরুত্ব দেন, যেন এই আচরণের ফলে তখনকার সমাজে সুসমাচারের দুর্নাম না হয়।

এই প্রাচীন জগতে স্বামীরা ঘরের কর্তা হিসেবে স্ত্রীর মস্তক বলে গণ্য হন। আগেই যেমন বলা হয়েছে, এটা বাইবেলের আদর্শ নয়, বরং জীবনের বাস্তবতা, যার আর কোনো মূল্যায়ন করা হয় না। কিন্তু এর নতুন সংজ্ঞা দেওয়া হয়। কারণ নতুন নিয়মে কোথাও পুরুষদের ভালোভাবে শাসন করতে বা বিজ্ঞতার সঙ্গে কর্তৃত্ব করতে আদেশ দেওয়া হয়নি। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আদর্শে মস্তক হওয়ার এক নতুন সংজ্ঞা পাওয়া যায় (ইফিষীয় ৫:২১-৩৩): মস্তক, অর্থাৎ স্বামী, নিজের স্ত্রীকে নিজের মতো ভালোবাসবেন, আত্মত্যাগ পর্যন্ত ভালোবাসবেন। তিনি স্ত্রীর ভরণপোষণ করবেন ও যত্ন নেবেন।

এই কথাগুলো যখন সমবেত গৃহমণ্ডলীতে পড়ে শোনানো হতো, তখন প্রাচীন ঘরের প্রত্যেক বাসিন্দাকে সরাসরি সম্বোধন করা হতো। সেটাই ছিল অস্বাভাবিক। কিন্তু শুধু তা-ই নয়, পৌল পুরুষদের কাছে যা দাবি করতেন, তা ছিল বৈপ্লবিক। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি, সন্তান ও দাসদের

প্রতি এমন আচরণ ঘরের পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোকে এক ধরনের প্রেমময় পিতৃতন্ত্রে পরিণত করল। আর এভাবে পুরুষ ও নারীর সম্পর্কের কাঠামো সেই দিকে এগোতে লাগল, যা ঈশ্বর শুরুতে চেয়েছিলেন। তখনকার সামাজিক কাঠামোকে আক্রমণ না করেই। তা করলে সুসমাচারের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হতো। পতিত জগতের এই দৃঢ় কাঠামোগুলো খ্রীষ্টের প্রেমের দ্বারা ভেতর থেকে ক্ষয়ে যায়, শিথিল হয় ও বদলে যায়।

বিশ্বাসী হয়ে ওঠা দাসদের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটত। তাঁরা যেন নিজেদের মনিবদের বশ্যতা স্বীকার করেন। আজ কেউ প্রেরিতদের এই কথাগুলো দিয়ে দাসপ্রথাকে ন্যায্য প্রমাণ করার কথা ভাববে না। অথচ খ্রীষ্টানরা ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত তা-ও করেছেন। প্রাচীন যুগে দাসপ্রথা ছিল সমাজের দৃঢ় ও অস্তিত্বগত অংশ। আজ আমাদের কাছে তা আর কল্পনাও করা যায় না। দাসপ্রথা কখনো ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল না – এটি মানুষকে অবজ্ঞা করে। তবুও বিশ্বাসী হয়ে ওঠা দাসকে এখন আহ্বান করা হয়, তিনি যেন অন্তর থেকে সেবা করেন, যেন প্রভুরই সেবা করছেন। ঠিক তেমনি মনিবদেরও আহ্বান করা হয়, তাঁরা যেন নিজেদের দাসদের প্রতি দয়ালু আচরণ করেন, বিশেষ করে এই কারণে যে তাঁদের অনেকে এখন তাঁদের ভাই। খ্রীষ্টে এখন আর স্বাধীন ও দাস বলে কিছু রইল না।

প্রেরিতেরা যে প্রাচীন ঘরের এই বিন্যাসকে (স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, দাস) সম্বোধন করেছেন, তা স্পষ্ট করে যে এই নির্দেশগুলো আমাদের কাছে নয়, বরং আমাদের জন্য লেখা। পার্থক্য হলো, আমাদের আজকের সামাজিক কাঠামোয় দাসপ্রথা আর নেই, নেই সেই প্রাচীন ঘরও, যার কেন্দ্রে ছিলেন pater familias, অর্থাৎ কর্তৃত্বকারী গৃহকর্তা। পুরুষ ও নারী আইনের চোখে সমান অধিকারসম্পন্ন। আর এর জন্য আমরা কৃতজ্ঞই হতে পারি। আজ অনেক যৌথ আবাস, অনেক একক-ব্যক্তির সংসার ও বৃদ্ধাশ্রম আছে, যা তখন ছিল না, আর তাই প্রেরিতদের কাছ থেকে সে বিষয়ে কোনো নির্দেশও নেই।

পৌল স্পষ্ট করেন, ঘরের শাসনকর্তা pater familias নন, বরং খ্রীষ্টই সকলের প্রভু। সবাই প্রথমে এই স্বর্গীয় প্রভুর কাছে দায়বদ্ধ।

তাহলে এই নির্দেশগুলো নিয়ে আমরা কী করব?

একটি বহুল প্রচলিত মত হলো, নারীর বশ্যতা সৃষ্টির শৃঙ্খলায় প্রোথিত। কিন্তু একমাত্র ভালো শৃঙ্খলা হলো পতনের আগের শৃঙ্খলা। কোনো স্তরবিন্যাস ছাড়া, পুরুষের মস্তক হওয়া ছাড়া, নারীর একতরফা বশ্যতা ছাড়া। পতনের পরেই সেই বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, যেখানে পুরুষ অন্যায়ভাবে ও কোনো বৈধ অধিকার ছাড়াই নারীর উপরে কর্তৃত্ব করে। আমি বলছি না যে এটা সব সময় ও মৌলিকভাবে খারাপ ছিল, কিন্তু কেউ তা আবার ফিরে পেতে চাইবে না, ঠিক যেমন দাসপ্রথাও নয়। তাই এই বাইবেলের বাক্যগুলো আমাদের সত্যিই তাদের ঐতিহাসিক পটভূমির আলোকে বুঝতে হবে।

এর অর্থ এই নয় – যেমন কেউ চট করে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে – যে ঈশ্বরের বাক্যকে আর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। বরং উল্টো: বশ্যতা ও প্রেমের এই নির্দেশগুলো যদি এভাবে যাপন করা হয়, তবে তা ঈশ্বরীয় আদর্শের সঙ্গে মেলে। কিন্তু এর চেয়ে ভালো একটি পথ আছে, যা পৌল ও পিতর নিজেরাই প্রস্তাব করেন। পৌল পরস্পরের বশ্যতা নিয়ে বলেন (ইফিষীয় ৫:২১), তারপর বিবাহের সম্পর্ককে এমন একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরেন, যেখানে তা বাস্তবায়িত হয়। **সত্যিই স্ত্রীরও নিজের স্বামীকে ভালোবাসা উচিত, যদিও নতুন নিয়মে তা মাত্র একবারই দাবি করা হয়েছে। আর ঠিক তেমনি স্বামীরও নিজের স্ত্রীর বশ্যতা স্বীকার করা উচিত। পিতর তা-ই বলেন "তদ্রূপ, হে স্বামিগণ" কথাটি দিয়ে, যখন তিনি ৩:৭ পদে ৩:১ পদের প্রতি ইঙ্গিত করেন, যেখানে তিনি নারীদের বশ্যতা স্বীকার করতে বলেন। তা ছাড়া তিনি বলেন, আমরা সবাই যেন পরস্পরের প্রতি নম্রতায় দৃঢ়ভাবে আবৃত থাকি (১ পিতর ৫:৫)।**

আজকের বিবাহ প্রাচীন যুগের মতো যাপন করা যায় না। কেউ কেউ তা একটি হালকা রূপে করার চেষ্টা করেন। **কিন্তু বশ্যতার ভিত্তি যদি সৃষ্টির শৃঙ্খলার এক ভুল ধারণা হয়, তবে তা বাইবেলসম্মত নয় – এমনকি তা ভালোভাবে চললেও নয়।** খ্রীষ্টীয় বশ্যতা (অর্থাৎ সহবিশ্বাসীদের মধ্যে, বিশ্বাসী স্বামী ও স্ত্রীসহ) দাসসুলভ বা অসম্মানজনক নয়। এটি নম্র, বিশ্বস্ত ও প্রেমপূর্ণ শ্রদ্ধা, সহযোগিতা ও সমর্থন। নম্রতা ও মৃদুতার মতো বশ্যতাও হওয়া উচিত এক স্বাভাবিক খ্রীষ্টীয় চারিত্রিক গুণ। আর আদর্শভাবে তা হওয়া উচিত পারস্পরিক।

নিজের সম্পর্কে আমার মনে হয়েছিল – আর অন্য পুরুষদের মধ্যেও তা লক্ষ করেছি – যে আমরা এমন আহ্বানকে একতরফা বশ্যতা হিসেবে নির্বিকারভাবে মেনে নিই। এর প্রভাব তো নারীদের উপর পড়ে, পুরুষদের উপর নয়। আমাদের যেভাবে শেখানো হয়েছে, এবং আমরা নিজেরা আমাদের মণ্ডলীতে, আংশিকভাবে সমাজেও, যেভাবে গড়ে উঠেছি, সেভাবেই আমরা তা বুঝি। দুঃখের বিষয়, এতে আমাদের হৃদয়ের প্রবণতাই প্রকাশ পায়।

প্রথম দৃষ্টিতে যখন নারীদের সীমাবদ্ধ করা হয়, তখন আমরা কেন সজাগ হয়ে জিজ্ঞাসা করি না, সংশ্লিষ্ট বাইবেলের পদগুলো কীভাবে বোঝা উচিত? যা আমাদের উপর প্রযোজ্য হলে আমরা প্রশ্ন তুলতাম, এমন কিছু আমরা সহজেই মেনে নিই। আসুন, আমরা আমাদের হৃদয়কে বদলে যেতে দিই এবং যীশু ও পৌলের পাঠশালায় যাই।

১৪ নর ও নারীর ভেদ আর নেই

লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকার প্রসঙ্গ এলে প্রায়ই গালাতীয় ৩:২৮ পদ উদ্ধৃত করা হয়:

> [গালাতীয় ৩:২৬-২৮, জার্মান এলবারফেল্ডার বাইবেল থেকে অনূদিত] কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসের মাধ্যমে তোমরা সকলেই ঈশ্বরের পুত্র। কারণ তোমরা যত জন খ্রীষ্টের উদ্দেশে বাপ্তাইজিত হয়েছ, সকলে খ্রীষ্টকে পরিধান করেছ।
>
> সেখানে ইহুদি বা গ্রিক নেই, দাস বা স্বাধীন নেই, নর ও নারী নেই (না পুরুষবাচক, না স্ত্রীবাচক); কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে তোমরা সকলেই এক।

প্রায়ই শুনি, পৌল এখানে পরিত্রাণের কথা বলছেন, যা এখানে উল্লিখিত সব জাতিগত ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর জন্য এবং শেষে দুই লিঙ্গের জন্যই কোনো ভেদ ছাড়া খোলা। বিষয়টি নাকি খ্রীষ্টে থাকার অবস্থা, পতিত সৃষ্টিতে আমাদের বাস্তব জীবন নয়। সেখানে নাকি এই পার্থক্যগুলো এখনও রয়ে গেছে।

কিন্তু পত্রের একেবারে শুরুতে পৌল কোন বিষয় তোলেন? পিতর ও ইহুদিরা অন্য জাতিদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন, যেন আলাদা টেবিলে বসে খেতে পারেন। এটাই ছিল সেই সমস্যা, যার উত্তর গালাতীয় ৩:২৮ দেয়। অর্থাৎ একেবারে ব্যবহারিক একটি মণ্ডলী-সমস্যা, যার সমাধান এই পদ করতে চায়।

এটা সত্য, আমরা যা, তা-ই থাকি; কিন্তু সবার জন্য এমন কিছু যোগ হয়, যা জাতি, শ্রেণি বা লিঙ্গ অনুযায়ী আমাদের পরিচয়ের চেয়েও বড়: পুত্রত্ব। পৌল প্রাচীন যুগের পুত্রত্বের মর্যাদার কথা বলেন। এর মধ্যে ছিল বিশেষাধিকার ও মর্যাদা, অধিকার ও উত্তরাধিকার। কন্যাদের জন্য এটা প্রযোজ্য ছিল না। ঈশ্বরের পুত্রত্ব পৌল বিশ্বাসীদের জন্য ঘোষণা করেন – পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য!

ইহুদি ধর্মে পরিত্রাণ, এবং পুরাতন চুক্তিতে এর যে অর্থ বোঝা হতো, তা এখানে উল্লিখিত গোষ্ঠীগুলোর জন্য আগেই উন্মুক্ত ছিল। গ্রিক ব্যক্তিকে ত্বকছেদের শর্তে ইহুদি ধর্মে দীক্ষা দেওয়া হতো। ইস্রায়েল জাতির মধ্যে পুরুষ ও নারীর মতোই স্বাধীন ও দাসও ছিল। পৌল তেমন নতুন কিছু বলতেন না। পরিত্রাণের দিক থেকে এই ব্যাখ্যা ভুল নয় ঠিকই, কিন্তু এটাই সব নয়।

বিষয়টি আরও বড় – মানুষ সম্পর্কে এক দৃষ্টিভঙ্গি। মূলত এই ২৮ পদ বলে যে সব মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, সবার মর্যাদা সমান, আর পাপী হিসেবে সবার সমস্যাও এক: তাদের খ্রীষ্টকে প্রয়োজন, আর তারা খ্রীষ্টকে পায়। এই তিন জোড়ার তালিকা আরও বাড়ানো যায়: বৃদ্ধ ও তরুণ, দরিদ্র ও ধনী, সবল ও দুর্বল, সন্তান ও বাবা-মা, প্রতিবন্ধিতাসহ ও প্রতিবন্ধিতাহীন মানুষ, ধর্মীয় বিধিতে শুচি ও অশুচি। গালাতীয়দের জন্য স্বাভাবিকভাবেই সবার আগে আসে এই কথা যে এখন ইহুদিরা ও

অন্য জাতিরা মশীহের পরিবারে সবাই সমান ও সবাই এক। সবাই ঈশ্বরের পুত্র। মণ্ডলীতে আমরা প্রত্যেকের সঙ্গে ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে সাক্ষাৎ করি। অন্য যে পার্থক্যগুলো এখনও রয়ে গেছে, সেগুলো পেছনে সরে যায়, এবং পরস্পরের সঙ্গে আমাদের আচরণ ও কথাবার্তা আর নির্ধারণ করে না।

পৌল এই তিনটি গোষ্ঠীর কথা বলেন, কারণ অমুক্ত জগতে তারা পরস্পরের সঙ্গে টানাপোড়েনে থাকে। মণ্ডলীতে এই পার্থক্যগুলো বিরোধের কারণ হতে পারে না। ইহুদিরা নিজেদের ঈশ্বরের মনোনীত জাতি মনে করত, অন্য জাতিদের তারা তুচ্ছ চোখে দেখত। ত্বকছেদ ছাড়া কেউ ঈশ্বরের জাতির অংশ হতে পারত না। দাসেরা ছিল সম্পত্তি, যাদের শোষণ করা হতো। তাদের কোনো মূল্য ছিল না, কণ্ঠস্বর ছিল না, অধিকার ছিল না। সেই যুগে নারীরাও ছিলেন সম্পত্তি এবং পুরুষের চেয়ে নিকৃষ্ট বলে গণ্য। তাঁদেরও কোনো কণ্ঠস্বর ছিল না, অধিকারও ছিল সামান্য। খ্রীষ্টে আমরা এখন একে অপরের সঙ্গে সেভাবেই সাক্ষাৎ করি, যেভাবে ঈশ্বর সব সময় চেয়েছেন। বাপ্তিস্ম ও বিশ্বাসের মাধ্যমে সবাই খ্রীষ্টকে স্বীকারকারী হয়ে ওঠে। সব সামাজিক, জাতিগত ও স্তরভিত্তিক পার্থক্য খ্রীষ্টে শেষ হয়ে গেছে। মণ্ডলীতে কেবল ভাই ও বোন আছেন। সেখানে ঈশ্বরের দৃষ্টির সামনে এই পার্থক্যগুলোর আর কোনো ভূমিকা থাকতে পারে না। নারী ও পুরুষের মর্যাদা যদি সমান হয়, তবে মণ্ডলীতে যত সেবাকাজ আছে, দুজনেই তা করতে পারেন। এটা এক যৌক্তিক সিদ্ধান্ত, যদিও এই পদের বিষয় সেবাকাজ নয়।

পৌল এখানে আদিপুস্তক ১:২৭ পদের "পুরুষ ও স্ত্রী" কথাটি তুলে নিয়েছেন। তিনি একধরনের লিঙ্গনিরপেক্ষ অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি দেন না। ১ করিন্থীয় ১১ অধ্যায়ে তিনি জোর দিয়ে বলেন, নারীরা যখন উপাসনায় প্রার্থনা করেন বা ভাববাণী বলেন, তখন তাঁরা যেন দৃশ্যত নারী হিসেবেই উপস্থিত হন, আর পুরুষদেরও যেন পুরুষ হিসেবে দেখা যায়; পৌল হয়তো পৌত্তলিক সংস্কৃতি ও উপাসনা-রীতির নানা দিক সম্পর্কে জানতেন, যেখানে লিঙ্গকে ইচ্ছাকৃতভাবে আড়াল করা হতো বা এমনকি মুছে ফেলা হতো, কিন্তু এখানে সে বিষয় নয়।

সৃষ্টির শৃঙ্খলা ও পরিত্রাণের শৃঙ্খলা পরস্পরবিরোধী হতে পারে না। পরিত্রাণের শৃঙ্খলা আদি, ঈশ্বরের অভিপ্রেত সৃষ্টির শৃঙ্খলাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। সেই শৃঙ্খলায় পুরুষ ও নারী সমমর্যাদার। সুসমাচারের প্রভাব নিরাময়কারী। প্রথমে মণ্ডলীতে, অর্থাৎ বিশ্বাসী মানুষদের মধ্যে। এগুলো ইতিবাচক ও আমূল পরিবর্তন। সুসমাচার পরিত্রাণের জন্য শক্তি, যা হাজার হাজার বছরের পাপময় কাঠামো ভেঙে দিতে পারে এবং গোটা সংস্কৃতি ও জাতিকে বদলে দিতে ও উদ্ধার করতে পারে। শেষ পর্যন্ত দাসপ্রথার বিলোপ, আমাদের গণতন্ত্র, আমাদের স্বাধীনতার অধিকার এবং লিঙ্গের সমান অধিকারও আংশিকভাবে পৌলের এই কথারই ফল। দীর্ঘ সময় ধরে সমাজে এগুলোর প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে। মণ্ডলীর তো পুরুষ ও নারীর ভূমিকার বিষয়ে এর পেছনে পড়ে থাকা উচিত নয়।

এই পদ এই ভূমিকাগুলো নিয়ে কথা না বললেও, এ কথা বলা যায় না যে কোনো সম্পর্কই নেই। এই পদ এমন এক ভিত্তি, যার উপর দাঁড়িয়ে বোনেরা কোনো ভেদ বা একতরফা বশ্যতা ছাড়াই সেই

সব সেবাকাজ করতে স্বাধীন, যার জন্য তাঁরা বরপ্রাপ্ত বা যোগ্য। এর জন্য কোনো কোটা-নিয়মের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন পরস্পরের প্রতি নম্র ও বিজ্ঞ আচরণ।

গালাতীয় ৩:২৮ হৃদয়ে খোদাই করে রাখতে হবে। ঈশ্বর কারও দিকে পক্ষপাতের চোখে তাকান না; তাহলে আমাদেরও তা করা উচিত নয় (রোমীয় ২:১১; যাকোব ২:১)।

১৫ আমাদের দোষ স্বীকার

“পুরুষোচিত ভাইয়েরা” – এর অর্থ কী? ১ করিন্থীয় ১৬:১৩ পদে পৌল বোনদের ও ভাইদের আহ্বান করেন, তাঁরা যেন পুরুষোচিত বা বীরোচিত ও বলবান হন। এর বিপরীত নারীত্ব নয়, বরং ভীরু আচরণ। বীরোচিত হওয়াকে আমি এখানে এভাবে ব্যাখ্যা করতে চাই: আমরা পুরুষেরা বীরোচিত হব এভাবে – সাহস করে আমাদের খ্রীষ্টে বোনদের সামনে বহু আগেই যা করা উচিত ছিল, সেই দোষ স্বীকার করব, আর সেই অনুযায়ী কাজও করব। আমরা পুরুষেরা ব্যাখ্যার একচ্ছত্র অধিকার নিজেদের জন্য দাবি করেছি, আর তার সঙ্গে কাজের একচ্ছত্র অধিকারও, যা দিয়ে আমরা নারীদের মণ্ডলীর সেবাকাজ থেকে বাদ দিয়েছি।

আমরা ভেবেছিলাম ঈশ্বরের সেবা করছি, অথচ করেছি ঠিক উল্টো!

ঈশ্বর, ইয়াহওয়ে এলোহিম, পুরুষ ও নারীর সৃষ্টিকর্তা, আমাদের ক্ষমা করো যে আমরা এমনভাবে ভেবেছি, দাবি করেছি ও কাজ করেছি, যেন বোনেরা সমমর্যাদার নন, বরং নিচু মর্যাদার। সমকক্ষ সঙ্গী নন, বরং আমাদের এক ধাপ নিচে।

প্রভু যীশু, আমাদের ক্ষমা করো যে আমরা ভেবেছি, নারীদের নীরব থাকতে হবে এবং জনসমক্ষে নিজেদের গুটিয়ে রাখতে হবে।

আমাদের ক্ষমা করো যে আমরা ভেবেছি, তুমি চাও না যে তাঁরা প্রকাশ্যে তোমাকে ও তোমার সত্য প্রচার করুন।

প্রিয় বোনেরা, আমাদের এই ভুল মনোভাবের জন্য আমাদের ক্ষমা করুন – আমরা ভেবেছিলাম, এটি ঈশ্বরীয় ও বাইবেলসম্মত! আমাদের ক্ষমা করুন যে কোনো কোনো পরিস্থিতিতে আমরা অন্যায়ভাবে আপনাদের বিবেকে অপরাধবোধ চাপিয়ে দিয়েছি।

আমাদের ক্ষমা করুন যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও প্রশ্ন আমরা আপনাদের ছাড়াই আলোচনা করেছি ও সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা আপনাদের পরামর্শ চাইনি!

আমরা পুরুষেরা ব্যর্থ হয়েছি। প্রায়ই, আর নিজেদের অজান্তেই, আমরা ছিলাম স্বার্থপর, আধিপত্য খাটানো সবজান্তা। নিজেদের বিষয়ে অন্ধ। আপনাদের, নারীদের বিষয়ে এবং আপনাদের আহ্বান ও বরদান বিষয়ে অন্ধ।

আমাদের ক্ষমা করুন, যেখানে আমরা ভীরু ছিলাম, আপনাদের সামনে ঠেলে দিয়েছি এবং আপনাদের উপর ভরসা করেছি – যেখানে আমাদেরই পুরুষের মতো দাঁড়ানো ও এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, আর আপনারা ন্যায্যভাবেই তা প্রত্যাশা করেছিলেন।

আপনাদের কাছে যা কঠিন ছিল এবং যা আপনারা কখনো বোঝেননি, সে বিষয়ে আমাদের উদাসীনতার জন্য আমাদের ক্ষমা করুন। আমরা কখনো আপনাদের জিজ্ঞাসা করিনি, এতে আপনাদের কেমন লাগে। আমাদের ক্ষমা করুন যে এই বৈষম্যমূলক মনোভাব ও শিক্ষা সম্পর্কে আপনাদের অনুভূতি আমরা জানতে চাইনি।

আমরা দুঃখিত। আমরা ভুল করেছিলাম।

মুক্ত থাকুন! আনন্দের সঙ্গে প্রভুর সেবা করুন!

আমরা আপনাদের সমর্থন করব – যেমন আপনারা সব সময় আমাদের সমর্থন করে এসেছেন, আমরা যা কিছু করেছি তা সত্ত্বেও।

১৬ শেষ কথা

বহু খ্রীষ্টান, যাঁদের কাছে বাইবেলই একমাত্র মানদণ্ড, "নারী-প্রশ্ন" অনেক আগেই মীমাংসা করে বোনদের জন্য পথ খুলে দিয়েছেন। আমার জীবনে এই উপলব্ধি দুঃখজনকভাবে অনেক দেরিতে এসেছে। তাই এই বইটিও আসলে সেকেলে, কারণ অনেক আগেই স্পষ্টভাবে বোঝা উচিত ছিল যে মণ্ডলীর জীবনের সব ক্ষেত্রে বোনদের সেবা ছাড়া আমাদের চলে না। আমরা পুরুষেরা পুরুষ ও নারী সম্পর্কে স্তরভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি আঁকড়ে থাকলে কেবল নিজেদেরই ক্ষতি করি। কিন্তু নিজের দৃঢ় বিশ্বাস বদলাতে কখনো দেরি হয় না।

এই বইয়ে যে প্রশ্নগুলো আলোচিত হয়েছে, বহু জায়গায় সেগুলোর মীমাংসা অনেক আগেই হয়ে গেছে, আর আমি পিছিয়ে পড়া একজন হিসেবে পরে এসে পৌঁছেছি। যুদ্ধ অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। অন্যেরা গত ৩০ বছর ধরে এই রণাঙ্গনে লড়েছেন। তাঁদের ধর্মতাত্ত্বিক কাজ থেকে আমি অনেক উপকৃত হয়েছি।

মণ্ডলীর সামনে আরও অনেক গভীর বিষয় আসছে। এমন সব বিষয়, যা লিঙ্গের প্রশ্নকে প্রচণ্ডভাবে এলোমেলো করে দেয়, আজ আলোচ্যসূচিতে রয়েছে এবং প্রবলভাবে সমাজের দৃষ্টিতে আনা হচ্ছে – যেমন রূপান্তরকামিতা (ট্রান্সসেক্সুয়ালিটি)। আমাদের সমাজে খ্রীষ্টান হিসেবে এর উত্তর আমাদের কাছে থাকতে হবে। আমাদের খ্রীষ্টানদের জোর দিয়ে তুলে ধরতে হবে যে দুই লিঙ্গ নিয়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনা অসাধারণ, আর তা রক্ষা করতে হবে। কিন্তু নারীরা মণ্ডলীতে কথা বলতে ও শিক্ষা দিতে পারবেন কি না, আমরা যদি এখনও তা নিয়েই আলোচনা করি, তবে আমরা চূড়ান্তভাবে সব প্রাসঙ্গিকতা হারাব, আর সত্যিকারের সমসাময়িক বিষয়গুলোতেও আমাদের কথা কেউ আর গুরুত্ব দিয়ে নেবে না, শুনবেও না।

এমনই একটি সমসাময়িক বিষয় হলো ট্রান্সহিউম্যানিজম, যা মানুষকে বাইবেলের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করে – এখানে বিষয়টি লিঙ্গের প্রশ্নের চেয়ে অনেক বড়। এখানে আমাদের চোখের সামনে বাবিলের মিনার নির্মাণের মতো আরেকটি ঘটনা ফুটে উঠছে, যা শেষকালের সেই ছবির সঙ্গে মেলে, যা বাইবেল আমাদের সামনে আঁকে।

"আসুন, আমরা এমন খ্রীষ্টান হই, যাঁরা এই জগতের সামনে বিবাহে, পরিবারে ও মণ্ডলীতে পুরুষ ও নারীর প্রেমময় সহযাত্রা নিজেদের জীবনে দেখিয়ে দেন। আসুন, আমরা এক বিভ্রান্ত ও দিশাহারা সমাজে আশার বাহক হই – যে সমাজ সৎ, খাঁটি আদর্শ খুঁজছে। আসুন, আমরা এমন আদর্শ হই, যাঁদের বৈশিষ্ট্য অন্য লিঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধা ও মূল্যবোধ। তখন, এবং কেবল তখনই, আজকের মানুষ আমাদের আদৌ লক্ষ করবে ও গুরুত্ব দেবে।"

গাব্রিয়েলে সিঙ্গার (Gabriele Singer)

পুরুষ ও নারী হিসেবে

ভালোবাসা, নেতৃত্ব, শিক্ষাদান

একসঙ্গে আরও ভালো!

মিলেমিশে আরও ভালো!

পরস্পরের সঙ্গে আরও ভালো!



“আমি ঈশ্বরের বাক্যে দেখি যে যীশু – যাঁকে কোনো পুরুষের ভূমিকা ছাড়াই এক নারী গর্ভে ধারণ করেছিলেন – নারীদের চুপ করিয়ে দেননি, বরং উল্টো, তাঁদের কথা বলতে আহ্বান করেছিলেন। দেখি, তিনি অনুমোদন করেছিলেন যে একজন নারী রব্বির চরণতলে বসে শিখুক, যেমন পৌল গমলীয়েলের চরণতলে বসেছিলেন। আর তিনি একজন নারীকে নিজের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ যাজকীয় সেবা করতে দিয়েছিলেন এবং তাঁর হাত থেকে নিজের সমাধির জন্য অভিষেক গ্রহণ করেছিলেন। নারীরাই ছিলেন ক্রুশের কাছে শেষ জন, আর কবরের কাছে প্রথম জন। ক্রুশ থেকে বলা ৭টি ‘বাণী’ – তার মধ্যে ৫টির সাক্ষী ও বর্ণনাকারী কেবল নারীরা (রোমান সৈন্যদের বাদ দিলে), আর পরিত্রাণের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূল ঘটনাগুলোর সাক্ষী একমাত্র নারীরাই। পুনরুত্থানের পরে যীশু ইচ্ছা করেই নারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাঁদের দায়িত্ব দিলেন, যেন তাঁরা তাঁর ভাইদের গিয়ে বলেন যে তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন। মুক্ত হওয়া ঈশ্বরের মণ্ডলীতে নারীর পূর্ণ সমতাই যে ঈশ্বরের আদি ও অপরিবর্তনীয় উদ্দেশ্য – এ কথা চিরকালের জন্য স্পষ্ট করতে তিনি আর কী করতে পারতেন?” ক্রিস্টিয়ান বেসে (Christian Beese)

এক দুরারোগ্য ব্যাধির মতো, প্রাচীন, দৃঢ় ও গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসা, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া আগাছার মতো খ্রীষ্টান পুরুষদের নারী-ভাবনা শুরু থেকেই তাদের চারপাশের জগতের প্রতিধ্বনি, আর দুঃখের বিষয়, তাদের হৃদয়েরও। সচেতনভাবে ও অবচেতনভাবে, কঠোরভাবে, মাঝারিভাবে,

এমনকি প্রেমপূর্ণভাবেও তা যাপন করা হলেও, বাইবেলীয় এবং তাই ঈশ্বরীয় সত্যের দিকে মন ফেরানো ছাড়া আর কোনো পথ নেই – যে সত্য একাই মুক্ত করে।

Hans-Jörg Ronsdorf

“পিতৃতান্ত্রিক চিন্তাধারা থেকে নারীবান্ধব চিন্তাধারায় পৌঁছানো সহজ পথ নয়। এর জন্য আমাদের জগৎ ও তা কীভাবে চলে, আমাদের বিশ্বাস ও ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক, পরস্পরের সঙ্গে ও আমাদের বিশ্বজগতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক – এই সব বিষয়ে আমরা যা কিছু বুঝি বলে মনে করতাম, সবকিছু নতুন করে কল্পনা করতে হয়। এটি ঠিক ততটাই কঠিন পরিবর্তন, যতটা কঠিন ছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের জন্য বিশ্বজগৎ সম্পর্কে ভূকেন্দ্রিক ধারণা থেকে সূর্যকেন্দ্রিক ধারণায় যাওয়া। প্রথম যে বিজ্ঞানীরা প্রস্তাব করেছিলেন যে পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘোরে, উল্টোটা নয়, তাঁদের মণ্ডলী থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, কারণ মনে করা হতো, এটি ঈশ্বরের ক্ষমতার প্রতি হুমকি। একইভাবে এমন এক পিতৃতান্ত্রিক বিশ্বদৃষ্টি থেকে মুক্ত হওয়া খুব কঠিন, যেখানে স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া হয় যে নারীরা পুরুষদের দ্বারা পরিচালিত ও আধিপত্যের অধীন হবেন, এবং ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলো পুরুষেরাই সংগঠিত ও পরিচালনা করবেন। সমান অধিকারভিত্তিক-সমতাভিত্তিক বিশ্বদৃষ্টি এমন এক বিশ্বদৃষ্টি, যা নারী ও পুরুষকে পারস্পরিক সম্পর্কে দেখে – যাঁরা ক্ষমতা ভাগ করে নেন, একে অপরের বরদান চিনে নেন, এগিয়ে নিয়ে যান ও মুক্ত করে দেন। আর একে অপরের সঙ্গে সমান শ্রদ্ধা ও সমান মর্যাদায় আচরণ করেন।” বারবারা রিড (Barbara Reid)

“সুসমাচারের আত্মা যাঁকে স্পর্শ করেছে, তিনি এ বিষয়ে একমত হবেন যে নারীদের উপর অভিভাবকগিরি ফলানো এবং ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য তাঁদের পঙ্গু করে রাখা এক পিতৃতান্ত্রিক ভূমিকা-ধারণা শুধু অন্যায় নয়, বরং ঈশ্বরের মণ্ডলীর অবর্ণনীয় ক্ষতি করেছে। যদিও এটা কখনো হীন উদ্দেশ্যে, ক্ষমতার লড়াইয়ের মনোভাবে বা ইচ্ছাকৃত অবমাননার জন্য ঘটেনি, বরং প্রায়ই পবিত্র শাস্ত্রের এক মর্মান্তিক ভুল বোঝাবুঝির কারণে ঘটেছে, তবুও এখন সময় এসেছে মর্যাদাহানিকর ঐতিহ্যগুলোকে সাহসের সঙ্গে প্রশ্ন করার এবং সেগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার, যেন নারীরাও নিজেদের চরণ ‘প্রশস্ত ভূমিতে’ রাখতে পারেন এবং যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা অর্জিত পূর্ণ মুক্তি অবশেষে কৃতজ্ঞচিত্তে অভিজ্ঞতা করতে পারেন।” হার্টমুট ক্রুগার (Hartmut Krüger)

বাইবেলের লেখাগুলোর সাংস্কৃতিক পটভূমি উপেক্ষা করলে মানুষ লেখার আক্ষরিক বাক্যে স্থির থাকে না; বরং বাইবেলের শব্দাবলি প্রায়ই, হয়তো অধিকাংশ সময়ই, নিজের বর্তমান যুগের সাংস্কৃতিক প্রত্যয়ের প্রক্ষেপণ-পর্দা হয়ে ওঠে। বহু ইভানজেলিক্যাল খ্রীষ্টানের (বাইবেলকে সর্বোচ্চ মান্য করেন এমন প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রীষ্টানদের) কাছে যা এক চিরন্তন বাইবেলীয় সত্য হিসেবে প্রচার করা হয়েছে, তা আসলে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সৃষ্টি। তাই মণ্ডলীর সেবাকাজে নারীদের সমান অধিকারের পক্ষে দাঁড়ানো আজকের নারীবাদের যুগের হাওয়া অনুসরণ করা নয়, কারণ সেখানে বিষয়টি অনেক আগেই আরও সুদূরপ্রসারী দাবিতে পৌঁছে গেছে। সেখানে বিষয় হলো বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিদ্যমান ভূমিকাগুলোর অদলবদল, অথবা লিঙ্গেরই সামগ্রিক বিলোপ। যিনি

দশকের পর দশক ধরে মতবাদভিত্তিক স্বীকারোক্তি বা প্রত্যয় চাপিয়ে দেওয়ার অনুশীলন করেছেন এবং এর জন্য লড়াই করেছেন, তিনি বিতর্কিত প্রশ্নে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানের অন্তত একটি গুরুতর আলোচনা চালাতে কীভাবে শিখবেন?

থর্স্টেন ডিৎস (Thorsten Dietz)

১৭ লেখকের অন্যান্য বই

Und die Toten leben doch (তবুও মৃতেরা জীবিত), Bielefeld, ১৯৯২

Seitenwechsel – Von Adam zu Christus (পক্ষ বদল – আদম থেকে খ্রীষ্টে), Bielefeld, ২০১১

Entrückung, Himmel, Ewigkeit – Ein neuer Blick auf alte Themen (ঊর্ধ্বে নীত হওয়া, স্বর্গ, অনন্তকাল – পুরোনো বিষয়ে নতুন দৃষ্টি), Nürnberg, ২০১৫

Gottes Lamm, Golgota und die Ewigkeit (ঈশ্বরের মেষশাবক, গলগথা ও অনন্তকাল), Wuppertal, ২০১৫

Fantastische Himmelwelt, Lehre und Leben der Himmelwelt im Epheserbrief (অপূর্ব স্বর্গীয় জগৎ – ইফিষীয় পত্রে স্বর্গীয় জগতের শিক্ষা ও জীবন), Nürnberg, ২০১৬

Gott spricht, Eine erklärende Übertragung der allgemeinen Briefe und der Offenbarung (ঈশ্বর কথা বলেন – সাধারণ পত্রগুলি ও প্রকাশিত বাক্যের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ), Sulzberg, ২০১৭

Epheser, nacherzählt, erklärt für heute (ইফিষীয় – নতুন করে বলা, আজকের জন্য ব্যাখ্যা), Sulzberg, ২০১৮

Gods good Gospel, Gottes gutes Evangelium (ঈশ্বরের শুভ সুসমাচার), Sulzberg, ২০১৯

Markus, nacherzählt, erklärt für heute (মার্ক – নতুন করে বলা, আজকের জন্য ব্যাখ্যা), Sulzberg, ২০১৯

Galater, nacherzählt, erklärt für heute (গালাতীয় – নতুন করে বলা, আজকের জন্য ব্যাখ্যা), Sulzberg, ২০২০

Die Briefe des Johannes, nacherzählt, erklärt für heute (যোহনের পত্রগুলি – নতুন করে বলা, আজকের জন্য ব্যাখ্যা), Sulzberg, ২০২০

Frauen, vergebt uns! – Die Rolle von Frau und Mann (নারীরা, আমাদের ক্ষমা করুন! – নারী ও পুরুষের ভূমিকা সম্পর্কে), Sulzberg, ২০২০

Ein König voller Pracht – Die gute Botschaft von Jesus, dem Messias (মহিমাময় এক রাজা – মশীহ যীশুর সুসমাচার), Augsburg, ২০২২